বরের বাপ

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ রায়

বৈশাখ, ১৩২৮

মূল্য ১৲ টাকা।

প্রকাশক
শ্রীভোলা নাথ
দেব
মজুমদার
লাইব্রেরী
২৩, ঝামা পুকুর
লেন

১ম সংস্করণ

প্রিন্টার
বিহারি মজুমদার
মজুমদার প্রেস
১৩৬ অপার চিৎপুর রোড।

উপহার—

বরের বাপ

(১)

অনিলা যখন একটুখানি ছিল, তখন তাহার সৌন্দর্য্যের পরিচয় বড় একটা পাওয়া যাইত না। ক্রমে যখন সে তেরো বৎসরে পদার্পণ করিল, তখন একদিন সকলেই মনে করিল,—না, মেয়েটী মন্দ নয়—দেখিবার মত বটে!

কথাটা প্রথম টের পাইল, মেয়েটীর শৈশবের খেলার সাথী একটী বালক। কিরণ অনিলার প্রতিবেশী। বাল্যকালে উহাদের উভয় পরিবারে বেশ সম্প্রীতি ছিল। কিরণ তখন পাড়াগাঁয়ে থাকিয়াই পড়িত, সুতরাং উভয়েই প্রতিদিন দেখা সাক্ষাৎ হইত।

দশ বৎসরে পড়িয়া কিরণ পিতামাতার সঙ্গে প্রবাসে চলিয়া যায়। তাহার পিতা এলাহাবাদে কমিশরিয়টের কাজ করিতেন, সেইখানেই সে ক্রমে যৌবনে পদার্পণ করে। তারপর এই প্রবাস অবস্থানের কয়েক বৎসর পরে সতের বৎসর বয়সে পুনরায় দেশে ফিরিয়া কিরণের সর্ব্বপ্রথম মনে হইল, অনিলাকে সে যাহা দেখিয়া গিয়াছিল সে আর সেইটী নাই!

অনিলার রংটা যে খুব বদলাইয়া গিয়াছিল এবং নাক, চোক ও মুখ সব এ কয় বৎসরে একবারে ডিগ্‌বাজী খাইয়া গিয়াছিল, তাহা নিশ্চয়ই নয়; কিন্তু তবু এই সকলের কেমন একটা

সামঞ্জস্য এখন তাহার মুখখানিকে এক রকম নয়নরঞ্জন করিয়া তুলিয়াছে, তাহা সে স্পষ্ট লক্ষ্য করিল। সে ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিল, তাহার মুখখানি সেইরূপই রহিয়াছে, নাকের ঈষৎ চাপা রকমটা একটুকুও বদলায় নাই, চোক দুটীও যে বিশেষ অঙ্গবিস্তার করিয়াছে, তাহাও বোধ হয় না; সকলই প্রায় তেমনই, কিন্তু তথাপি কিসের একটা কি আলোকে তাহার সমস্ত দেহখানি পরিপ্লুত! রং-এর কাজ হইয়া মেটে প্রতিমায় গর্জ্জনের ভার্ণিসটী পড়িবামাত্র তাহাতে একটা আলাদা রকম খোলে, কিরণের বোধ হইল, অনিলার দেহেও তেমনি একটা কি আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন আসিয়াছে।

সাত বৎসর পরে বাল্যবন্ধু কিরণকে দেখিয়া প্রথমটা অনিলা তাহার সম্মুখীন হইতে পারিল না, একটু সঙ্কোচ বোধ করিল। কিন্তু কিরণের মা যখন তাহাকে একদিন তাঁহাদের বাড়ীতে লইয়া যাইয়া উভয়কে একসঙ্গে খাইতে বসাইলেন, তখন আর কাহাকেও কাহারো সঙ্কোচ করিবার উপায় রহিল না। তারপর, অনিলা ও কিরণ—উভয়েই একটু মুখর ছিল, পূর্ব্ব ঘনিষ্ঠতাটা অতি সহজেই জমিয়া উঠিল।

কিরণ বলিল, "তুই এত বড়টী হয়েচিস্ পুঁটী? আমি তোকে যা দেখ্‌বো বলে মনে ক'রে এসেছিলুম, তা মনে ক'রে যে এখন আমার নিজেরই বড্ড হাসি পাচ্ছে।"

অনিলা একটু হাসিয়া কহিল, "তুমিও কি কিরণদা বড্ড আগের মতনটী রয়েছ? আচ্ছা ওই ছবিখানার দিকে একবার তাকাও দেখি।"

দেয়ালে কিরণের ছোট্টবেলাকার একটা ছবি টাঙ্গানো ছিল, অঙ্গুলি নির্দ্দেশে অনিলা এখন সেইটাই দেখাইল; কিরণ 'হো হো' করিয়া হাসিয়া উঠিল।

আহারাদির পরে পূর্ব্বঘনিষ্ঠতা স্থাপন করিয়া অনিলা বাড়ীতে ফিরিয়া আসিলে, তাহার মনটা বেশ প্রফুল্লিত হইয়া উঠিল। কিন্তু তেরো বৎসরের বালিকা সতেরো বৎসরের বালকের প্রীতিলাভে একদিনেই কোন সুখের স্বপ্ন দেখিয়া আকাশকুসুম রচনা করিয়াছিল কি না, এ প্রশ্নের আমি উত্তর দিতে পারিব না।

কিরণ ও অনিলার সাংসারিক অবস্থার মধ্যে 'আসমান-জমিন' ব্যবধান ছিল। কিরণ ছিল অবস্থাপন্ন ভাগ্যবানের সন্তান, অনিলা অসচ্ছল গৃহস্থ ভদ্রলোকের দুহিতা। আবার এই কয় বৎসরের এই বিচ্ছেদের কালটাতে উভয় পরিবারের এই পার্থক্যটা আরও বিষম হইয়া উঠিয়াছে। কমিসরিয়েটের কাজ করিয়া করিয়া একদিকে কান্তিবাবু চতুর্গুণ ধনী হইয়া উঠিয়াছেন, অপরদিকে অনিলার পিতা ব্রজমোহনবাবু এই কয়টা বৎসরে উল্টাদিকে ধাপের পর ধাপ নামিতে নামিতে দারিদ্র্যের একবারে শেষ সোপানটাতে আসিয়া ঠেকিয়া পড়িয়াছেন। এ সবই অনিলা জানিত। তাই, এ অবস্থায় কিরণের প্রতি তাহার যে কোন বড় প্রলোভন থাকা সম্ভব নয়—তাই বলিতে হয়। অনিলা এমন প্রলোভন মনে পোষণ করিতেছে—এ কথা সহজে বলা চলিত না। ধনী বাল্যবন্ধু কিরণচন্দ্র প্রবাসের এত বন্ধু-বান্ধব ত্যাগ করিয়া আসিয়া আজিও যে তাহাকে চিনিতে পারিয়াছে এবং চিনিয়া সাদরে সেই বাল্যের ধূলাখেলার খাতিরে বন্ধুর মতই

গ্রহণ করিয়াছে, শুধু তাহাই স্মরণ করিয়া গর্ব্বে ও সুখে হৃদয় তাহার স্ফীত হইয়া উঠিল।

আনন্দটা অনিলা গোপন করিয়া বা চাপা দিয়া রাখিতে পারিল না। ঘরে ফিরিয়া, কি করিয়া তাহার এ সৌভাগ্যের কথাটা সঠিক ও সালঙ্কারে সে পিতামাতাকে উপহার দিবে, ক্রমাগত সেই সুযোগই খুঁজিতে লাগিল। পিতামাতা কিন্তু সহজে ধরা দিলেন না। 'তোর মাসী-মা কি দিয়ে খাওয়ালে রে পুঁটি?" মা মাত্র এই প্রশ্নটী করিয়াই নিশ্চিন্ত রহিলেন। পিতা বাহিরে ছিলেন, সন্ধ্যার সময়ে ঘরে ফিরিয়া আসিয়া হাতমুখ ধুইয়া আরাম করিয়া দারুণ গ্রীষ্মে তালপাতায় হাওয়া খাইতে লাগিলেন। রাত্রি প্রায় দশটার সময় ব্রজমোহনবাবু রান্নাঘরে খাইতে আসিলে, তখন কথাটা উঠিল। অনিলা জাগিয়া ছিল, সাড়া পাইয়া নিকটে আসিয়া ঘেঁসিয়া দাঁড়াইল। গৃহিনী কথাটা উত্থাপন, করিলেন ব্রজবাবু কহিলেন, "এখন যে ওঁরা ঢের উঁচুতে—বলি তেমন আদর যত্ন পেলে কি?"

অনিলা ঠিক এই প্রশ্নটাই চায়। প্রশ্নটী পাইয়াই মাথা উঁচু করিয়া এক নিশ্বাসে বলিয়া ফেলিল, "না গো না, বড্ড ভাল মানুষ ওঁরা, আমি যেতে কত আদর করেই ঘরে নে গেল, তোমাদের সবাইর কথা কত খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিজ্ঞেস কল্লে, কিরণ দা এত লেখাপড়া শিখে এসেছে—তবু আমায় কত খাতির করে একসঙ্গে বসিয়ে খাওয়ালে। আমি কি পড়ি, কি চাই, তাকে কতটা মনে রেখেছি, সব জিজ্ঞাসা কল্লে। আর এবার সহরে গিয়ে আমার জন্যে নাকি ভাল ভাল কি সব ছবি ও গল্পের বই পাঠিয়ে।

দেবে—তাও বল্লে। আরও কত কি, সব কথা এখন মনে ক'রে বল্‌তেও পার্ব্বো না, বাবা!"

ব্রজমোহন কথাগুলি গিলিতে লাগিলেন, অনিলা থামিতেই একটুখানি কি ভাবিয়া বলিলেন, "জায়গা করে দাও গিন্নি: কাল সকালেই আমাকেও একবার ওদিকে যেতে হচ্ছে। অবশ্য নানা কথা ভেবে কান্তিদার সঙ্গে সাক্ষাৎ কর্ত্তে বিলম্ব করে ফেলেছি, কাজটা বোধ হয় ভাল হয় নি।"

গৃহিনী ঘরের মেঝেতে আসন বিছাইতে ছিলেন; বিছাইতে বিছাইতে সে কথায় সমর্থন করিলেন। আগ্রহ সহকারে কহিলেন, "হাঁ হাঁ—যেয়ো। বড় লোক ওঁরা, আমাদের এত খোঁজ খবর নিচ্ছেন—আর দেরী করে ফেলাটা ভাল দেখাবে না।"

ব্রজমোহন কহিলেন, "তুমিও যেয়ো, কাল হোক্, পরশু হোক্ একবার যেয়ে বউঠাকুরুণের সঙ্গে দেখা করে এসো।"

গৃহিনী হাসিয়া কহিলেন, "সুদ শুদ্ধ দেনা শোধ কর্ব্বে, তাই ভাব্‌ছেন বুঝি?"

সে দিন রাত্রিতে আহারাদির পর ঘুমাইতে যাইয়া ব্রজমোহন আর একটা বিচিত্র কথা বলিলেন। "ও গো একটা কথা ভাব্‌চি। মেয়েটা বড় হয়ে উঠ্‌লো, কোন দিকে কোন পথ বেরোচ্ছে না। এই কিরণ ছেলেটার কথায় যেন মনে কেমন একটা লোভ হচ্চে।" এক মুহূর্ত্ত অবাক্ হইয়া থাকিয়া বিপুল বিস্ময়ে গৃহিনী বলিলেন, "ওকি কথা? ক্ষেপ্‌লে? রাজরাজড়া ওঁরা, ওসব কথা মুখে এনো না।"
ব্রজমোহন কহিলেন, "কিন্তু আমরা যে ওঁদের পাল্টা ঘর!"

বরের বাপ

গৃহিনী কহিলেন, "হোক্ পাল্টা ঘর। কুলে আজকাল আর চলে না—অর্থে চলে বটে, অর্থ থাক্‌তো তো কুল না থাক্‌লেও সাহস কর্ত্তে পার্ত্তে। টাকা নেই, চুপ করে থাক, লজ্জা পাবে। বরং তার চেয়ে সেই গৌরীপুর কাছারীর গরীব ছেলেটার সন্ধান দেখ।" ব্রজমোহন বিরক্ত হইলেন। কহিলেন, "সে যে বেতন পায় মাত্র কুড়িটী টাকা! এ কুড়িটী টাকা নিয়ে আজকালের দিনে নিজেই খাবে কি, আর পরিবারকেই বা খাওয়াবে কি?"

গিন্নী কহিলেন, "আমাদেরও তাই। পরের হলেই খুঁৎ ধরা, আর নিজের বেলায় ও কিছু নয়—এ কাজের কথা নয়! আর পাত্রটী, ভাল হোক্ মন্দ হোক্, আমাদের সাধ্যের মধ্যে রয়েছে। যাকে পাবে না, তার পেছনে পেছনে ঘোরা, আর আস্‌মানের চাঁদের দিকে হাত বাড়ানো—"

ব্রজমোহন বলিয়া উঠিলেন, "পাবো কি না, তা খবর না নিয়েই বল্‌বো কি করে? চেষ্টায় কি না হয়। একবার আমি জিজ্ঞাসা কর্ব্ব, তার পর যা হবার তাই হবে। বড় মানুষ তারা—টাকার জন্য যে কাতর হবে এমন মনে হয় না! আর শোননি, কত বরের বাপ যে সভাসমিতি কচ্ছে—পণ নেবেন না।"

বাধা দিয়া গিন্নী বলিলেন, "বরের বাপ?" ব্রজমোহন বলিলেন, "তবে কি?"

গিন্নী কহিলেন, "ক'নের বাপ বল। আর বড় জোর না হয় বর নিজে। বরের বাপের দায় পড়ে গেচে—" ব্রজমোহন বিরক্তির সহিত কহিলেন, "তা দায় পড়ুক, না পড়ুক, হুজুগ যখন

উঠেচে, তখন যে-ই উঠিয়ে থাক্—মান্‌তে হবে তো সবাইকে। কনের বাপেরা সবাই জোট্ বেঁধে যখন বলে উঠ্‌বে—দেব না আমরা টাকা কোন বরকে, তখন বরের বাপকে আস্‌তেই হবে তো ঐ কুল ও সৌন্দর্য্যের কাছে ?”

সামাজিক তর্কটা ঘুরিয়া গেল। কর্ত্তা অপেক্ষা গিন্নী এই নরকনে সমস্যাটা কিঞ্চিৎ বেশী বুঝিয়াছিলেন, তা সত্য, কিন্তু রমণী সুলভ রহস্যের ইঙ্গিত পাইয়া গৃহিনী এখন এই লঘুপাক জিনিষটার দিকেই ঝুঁকিয়া পড়িলেন। হাসিয়া কহিলেন, “তুমি ভাব, তোমার মেয়ের চাইতে সুন্দরী মেয়ে আর কোন কুলীনের ঘরে আর নাই। এমনই তিলোত্তমা নন্দিনী তোমার—”

এবার ব্রজমোহন উষ্ণ হইলেন। কহিলেন, “কে তিলোত্তমা, কে নয় গিন্নি—তার বিচার সকলে এক করে না। কিরণের চোখে কি যে সুন্দর আর কি যে অসুন্দর লাগ্‌বে, তা তুমিও বল্‌তে পার না, আমিও বল্‌তে পারিনে। হাঁ, তবে এটুকু বেশ জানি, মেয়ে আমার কুৎসিৎ নয়; আর এক সঙ্গে দাঁড় করালে, অনেক সুন্দরী মেয়ের চাইতে মানায়ও বেশী !”

সে রাত্রিতে গৃহিনী আর বাক্য ব্যয় করিলেন না। পরদিন প্রত্যূষে উঠিয়া ব্রজমোহন কান্তিবাবুর বাড়ীর দিকে চলিলেন। আকারে ইঙ্গিতে পূর্ব্ব রাত্রির সতর্কতাগুলি আবার যথা সম্ভব স্মরণ করাইয়া দিয়া,—কোনও অসাবধান কথা যাহাতে মুখ হইতে না বাহির হয়, গৃহিনী বার বার সে সাবধান করিয়া দিলেন।

বড় লোকেদের বৈঠকখানায় সতরঞ্চের উপর পরিষ্কার চাদর ঝক্ ঝক্ করিতেছে। এখানে সেখানে দু'টো একটা তাকিয়া পড়িয়া আছে। দু'একটা বাদ্য যন্ত্রও একধারে শোভা পাইতেছে। একটু নিম্নে সাধারণ শ্রেণীর দু'চার জন লোক—বুঝিবা অনুগ্রহপ্রার্থী—বসিয়া অনুচ্চস্বরে গল্পগুজব করিতেছে। সেই পরিষ্কার দুগ্ধ-ফেণ-নিভ শয্যার উপর একপাশে বসিয়া একটী ফুটফুটে বালক, একখানি মাসিক কাগজ পড়িতেছে। এমন সময় ব্রজমোহন যাইয়া সেইখানে উপস্থিত। একটু-খানি বালকটীর দিকে অবাক্ দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিয়া বলিয়া উঠিলেন, "কিরণ না?" বালকটী তাড়াতাড়ি উঠিয়া তাঁহার মুখের দিকে খানিকক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া হঠাৎ 'ঢিপ্' করিয়া একটা প্রণাম করিল; তারপর বিনীতভাবে বলিল, "আজ্ঞা হাঁ, বসুন, ডেকে দিচ্ছি বাবাকে।" বলিয়াই স্ফূর্ত্তির সহিত চলিয়া গেল। ব্রজবাবু এক মুহূর্ত্ত এই তরুণ যুবকটীর পশ্চাদ্‌ভাগ দৃষ্টির দ্বারা অনুসরণ করিয়া, কেমন একটু অন্য মনস্কভাবে সেই প্রকাণ্ড বিছানাটার এক কোণে বসিয়া পড়িলেন। বসিয়া বসিয়া কিরণের পরিত্যক্ত সেই মাসিক পত্রখানির পাতা উল্টাইতে লাগিলেন।

কিন্তু ব্রজমোহনের হৃদয়টা হঠাৎ কেমন অপ্রকৃতিস্থ হইয়া উঠিল; সাহস বা ভরসা যতটা লইয়াই কান্তিবাবুর নিকট প্রস্তাবটা উত্থাপন

করিতে আসিয়া থাকুন, এই আসন্নকার্য্যানুষ্ঠানকালে মনটা তাঁহার কেমন দমিয়া দমিয়া আসিতে লাগিল। ঘরের আসবাব-পত্রগুলি তাঁহার সাহসটাকে অনেকটা খর্ব্ব করিয়া দিতে ছিল। তিনি যে কি অসম্ভব, কি বিসদৃশ ও দুঃসাহসের প্রস্তাব পাড়িতে আসিয়াছেন তাহা সেই বিছানার তুষার শুভ্র চাদরখানি, সেই ধনীর চির সহচর তাকিয়া ও বাদ্য যন্ত্রগুলি এবং সেই উমেদারগণ তাঁহাকে মিনিটে মিনিটে জানাইয়া দিতে লাগিল। ব্রজমোহন ক্রমাগত কাগজ খানির পাতা উল্‌টাইতে উল্‌টাইতে আপনার অবস্থাটা মনে মনে এভাবে ওভাবে উল্‌টাইয়া পাল্‌টাইয়া আলোচনা করিতেছিলেন, এমন সময় হঠাৎ "কি হে, ভায়া যে! আচ্ছা যা হক্, এতকাল পরে!" বলিয়া কান্তিবাবু সহাস্যমুখে গৃহ প্রবিষ্ট হইলেন। ব্রজবাবু ব্যস্তত ও আগ্রহের সহিত উঠিয়া তাড়াতাড়ি তাঁহাকে অভিবাদন পূর্ব্বক বলিলেন, "এই যে দাদা! আসুন, আসুন, আজ ক'দিন থেকেই আস্‌বো আস্‌বো কচ্ছি, কিন্তু এমনি দুর্ভাগ্য, পেটের দায়ে ঘুরে ঘুরে এ পর্য্যন্ত দেখাটি কর্ব্বার অবসর হলো না। দিন, ধূলো দিন।"

বলিয়া প্রসন্ন আনন শুভ্রকেশ বৃদ্ধের চরণ ধূলি লইতে গেলেন, কিন্তু কান্তিবাবু অর্দ্ধ পথেই তাহাকে একবারে বক্ষে জড়াইয়া ধরিলেন।

ব্রজমোহনের ভীতি-পীড়িত হৃদয়টা হঠাৎ যেন একটা টনিক গলাধঃ করিয়া এই আলিঙ্গনটাতে বেশ প্রফুল্ল ও সবল হইয়া উঠিল। জোর করিয়া বাহুপাশ হইতে দেহটাকে মুক্ত করিয়া টানিয়া নীচে

লইয়া গিয়া, পদধূলি গ্রহণ করিয়া তিনি কহিলেন, "গরীব ভাইকে দয়া করে যে স্মরণ রেখেচেন তাই ঢের—এতটা কি আশা কর্ত্তে পারিনি।" কান্তিবাবু হাসিয়া বলিলেন, "বটে?" তারপর টানিয়া তাঁহাকে ফরাসের উপর বসাইয়া চাকরকে ডাকিয়া পান তামাকের ফরমাইশ করিলেন।

তখন গল্প চলিতে লাগিল। এলাহাবাদের কথা হইতে সুরু হইল। "তবে দাদা এতকাল ছিলে ভাল? উঃ! একবারে সাতটী বচ্ছর। এখানো যে মাতৃ ভাষাটা ভুলে যাওনি—তাই আশ্চর্য্যি হচ্ছি। আমি তো ভেবেছিলুম—এবার হয়ত কান্তিদাকে মেড়ো-টেড়ো এমনই কি একটা দেখ্‌বো। আচ্ছা, সেখানকার জলবায়ু ভাল?"

কান্তিবাবু কহিলেন, "চমৎকার! দেশটা মেড়োর বটে, কিন্তু অনেক বাঙ্গালী আজকাল ওখানে বাড়ী করেছেন; ঠিক প্রবাস বলে বোধ হয় না। আমদের স্বাস্থ্য দেক্‌চোনা? তোমার স্ত্রীটী নাকি বড্ড কাহিল হয়ে গেচে হে? একবার আমাদের সঙ্গে নিয়ে চল না?"

ব্রজমোহন দেখিলেন, কান্তিদা তাঁহার পরিবারেরও অনেক খবর রাখেন। কিন্তু একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, "আমাদের বরাতে কি ওসব পোষায় দাদা। ওসব হাওয়া বদলানো, হাওয়া খাওয়া আমাদের জন্য নয়। খেতেই পাইনে, তা আর বেড়াতে যাবো কি? তারপর মেয়েটাও বড্ড ডাগর হয়ে উঠেচে—"

কান্তিবাবু বলিলেন, "তইতো হে! পুঁটিটা যে একবারে বদ্‌লে গেচে। এই এতটুকু দেখে গিছিলুম, তা এখন আর সে পুঁটীকে

পুঁটী বলেই মনে হয় না। চেহারাটাও খুব ফিরেছে। পাত্র-টাত্র কিছু সন্ধান পেলে?"

"আরে, কোথা পাব? গরীবের কুলই কি আর রূপই কি। টাকা চাই—টাকা চাই। তা টাকা কোথা? সম্পত্তির মধ্যে ওই একটুকরো জমি, আর ওই দুটী কুঁড়ে ঘর! বাঁধা দিয়ে জোর ৩।৪শ টাকা জোগাড় হতে পারে। তাতে কি বিয়ের খরচা পোষায়, না বরের বাপের দারুণ ক্ষুধাই নির্ব্বাপিত হয়?"

কান্তিবাবু ব্যথিত হইলেন, তাহা তাঁহার মুখের ভাব দেখিয়াই স্পষ্ট বুঝা গেল, কিন্তু তিনি একটু মৃদু হাসিয়া কহিলেন, "কেন হে, তোমাদের বাঙ্গলা দেশে যে এখন দেকৃচি খুব হুজুগ—পণপ্রথা দূর করে দেবে, মেয়ের বিয়েতে আবার টাকা কেন?"

ব্রজোমোহনও একটু শুষ্ক হাসিয়া জবাব দিলেন, "ওটা কি জানেন, এখনও কথাতেই রয়েচে, কাজে এখনো ঢুকানো হয় নি—"

কান্তিবাবু তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিলেন, "কখনো হবেও না!" ব্রজবাবু চমকিয়া উঠিলেন। তাঁহার মনে হইল তাঁহার এত সাধের আকাশ মন্দির এক মুহূর্ত্তে বুঝিবা ধূলিসাৎ হইয়া গেল। একটু থতমত খাইয়া বলিলেন,—"কেন বলুন তো?"

কান্তিবাবু হাসিয়া কহিলেন, "দেখ ভায়া, এ বাঙ্গালা দেশটার একটা কি ব্যাধি আছে জান, বড় হুজুগে চলে। হুজুগে কাজ হয় না। এই যে পণপ্রথা পণপ্রথা বলে সবাই চেঁচামেচি কচ্ছে—আচ্ছা কজনে এ ব্যাপারটা ভালরূপ তলিয়ে বুঝে, তবে হৈ হৈ কচ্ছে

কেন বল দেখি। ওকি গায়ের জোরে বন্ধ হবার জিনিস, আর গায়ের জোরে হলেই, এ গায়ের জোর কি চিরকাল থাকে?"

ব্রজবাবু কহিলেন, "আপনি তবে কি বলেন?" কান্তিবাবু, বলিলেন, "আমি বলি, আমি কেন যে কেউ বুঝেচে সেই বলবে 'এটা কারো গায়ের জোরে হয়ও না, কারো গায়ের জোরে বন্ধও হবে না, এর জন্য বরের বাপও দায়ী নয়, কনের বাপও না, বর নিজেও নয়—"

ব্রজবাবু বিস্মিতভাবে প্রশ্ন করিলেন, "তবে কে?" "কয়েকটা ভ্রান্ত ধারণা—আর তদনুযায়ী দু'একটা ভ্রান্ত প্রথা! যেমন ধারণা, এই আমাদের যৌবন না পৌছুতে পৌছুতে কোনরূপে কন্যা বিদায় কর্ত্তেই হবে, এই আগ্রহটা—"

"এটাকে আপনি খারাপ মনে করেন?" কান্তিবাবু জোর দিয়া কহিয়া উঠিলেন, "খুব! অন্ততঃ এই পণপ্রথার দায়ীত্ব হিসাবে তো বাস্তবিক এটাই তো তলিয়ে দেখতে গেলে যত নষ্টের গোড়া—"

"কি করে দাদা?"

"কি করে? বলি, এটা না থাকলে কি, কনের বাপ মেয়ের বিয়ের জন্য এত ব্যস্ত হতো, না একটা বর ফসকে গেলে সে এত দশদিক অন্ধকার দেখতো, বরের পর বর সরে পড়লেও সে বেশ নিশ্চিন্তি হয়ে চুপটী করে ঘরে বসে তামাক ফুঁকতো, আর কদিন বাদে বরের দলের কেউ না কেউ একটা নিশ্চয় এসে দায়ে পড়ে হাতের মুঠোতে নিজে থেকে ধরা দিত। তখন দেখতে, বর নয়, কনে-কনে! কনে নিয়েই ভায়া দর কষাকষির ধূম পড়ে গেচে?"

ব্রজবাবু একটু ভাবিলেন। তারপর কহিলেন, "কিন্তু তা যে হবার উপায় নেই দাদা। শাস্ত্রেই রয়েচে—"

কান্তিবাবু বলিলেন, "রেখে দাও শাস্ত্র, শাস্ত্রজ্ঞানও আমাদের যেমন ভায়া, আমরা তা মেনেও চল্‌ছি বিলক্ষণ। ও কেমন জ্ঞান? যেমন পাঁঠা খেতে ইচ্ছে হলেই, মার কাছে নিবেদন! যখন দেখি মতলব হাসিল হচ্চে, শাস্ত্র আওড়াতে বসি—আর যখন দেখি, সে বালাই নেই, তখন কুচ্‌পরোয়াও নেই—ঠেলে চল—"

ব্রজবাবু এত কথা বুঝিলেন না। কথা কয়টী বলিয়া কান্তিবাবু হাসিতে লাগিলেন, তিনিও অগত্যা সে হাসিতে যোগ দিলেন। কান্তিবাবু হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিয়া বসিলেন,—"তোমার মেয়ের বয়সটা কত হে?"

"আজ্ঞে, এই বার তের।"

"ব্যাস্‌ তবে একটা পরামর্শ শুনবে? বল্লুম যা। পরখ করে দেখ্‌বে একবার?"

"কি দাদা—?"

"শুন তো বলি, নৈলে মিছি মিছি—"

"সাধ্যে হবে তো?"

"হওয়ালেই হয়—"

"আচ্ছা বলুন তবে—"

"চুপ করে বোসে থাক, ছেলের জন্য ব্যস্ত হয়ো না। আমি তোমার মেয়েটীকে দেকেচি—দেখবে ছেলে তোমার ঘরে অম্নি আস্‌বে—"

ব্রজবাবু বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে কান্তিবাবুর দিকে চাহিয়া রহিলেন। কান্তিবাবু হাসিয়া কহিলেন, "কি? ভরসা পাচ্ছ না?"

"আজ্ঞে, ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলুন তো।" বুঝিয়ে আর কি বলবো বল। এই এতক্ষণ তো অনেক কথাই বুঝিয়ে বল্লুম। বলি একবার এ বৃদ্ধের কথাটা মেনে চোখ বুজে পরক করেই দেখ না। অবশ্য টাকা দিয়ে প্রতিযোগীতার লোকের অভাব হবে না, কিন্তু এমন মেয়ে, গরজ না দেখালে যেচে নেবার লোকও যথেষ্ট আছে।" ব্রজবাবু আবার একটু ভাবিয়া মৃদু হাস্যে বলিলেন,—

"মাপ করুন, অত বুকের পাটা আমার হবে না দাদা, যাদের সঙ্গতি আছে, দায়ে পড়লে দু'চার হাজার ঝেড়েও পথ করে নিতে পার্ব্বে—তারা বরং—"

কান্তিবাবু বাধা দিয়া কহিলেন, "আচ্ছা যদি আমি ভরসা দিই? আমার তো ছেলে আছে—তাকে দেখেচ তুমি—যতদিন না তার বিয়ের কাল হয়—"

ব্রজবাবুর অন্তরটা লাফাইয়া উঠিল। কর্ণকে তিনি বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। একি অসম্ভব সৌভাগ্য। যে কথাটা বলিতে আসিয়া এত চেষ্টার পর এতক্ষণেও তিনি কি করিয়া উহার অবতারণা করিবেন, ভাবিয়া পাইতেছিলেন না, কান্তিবাবু স্বয়ংই উহা উত্থাপিত করিলেন, কেবল উত্থাপন করা নয়, উহাতে তাঁর নিজের হতেই যে আগ্রহ আছে, তাহারও ইঙ্গিত জানাইলেন। কি শুভ মুহূর্ত্তেই আজ না জানি তিনি ঘর হইতে বাহির হইয়া ছিলেন!

মহা উল্লাসিত হইয়া ব্রজবাবু বলিয়া উঠিলেন, "দাদার আজ্ঞা

শিরোধার্য্য। কিন্তু সে কতদিন জানতে পারি কি?" কান্তিবাবু একটু ভাবিয়া বলিলেন, "পারবে বৈকি, চারটী বচ্ছর, অন্ততঃ ভায়া, তার আগে তো আমি ছেলের বে দিচ্ছি না। একটু দমিয়া গিয়া ব্রজবাবু ইতস্ততঃ করিয়া কহিলেন, "কিন্তু বড় দীর্ঘ মেয়াদ এর মধ্যে বাঁচন মরণ আছে। যদিই একটা দুর্ঘটনা—"

কান্তিবাবু হাসিয়া উত্তর করিলেন, "যদি মরে যাই? ওঃ!" তারপর ব্রজবাবুর সসঙ্কোচ কি একটা প্রতিবাদের চেষ্টাকে হস্ত সঞ্চালনে থামাইয়া দিয়া বলিতে লাগিলেন, "মিছে প্রতিবাদ কর্ত্তে হবে না ভায়া, নয় কেন? সে তো একটা কথাই, আচ্ছা উইল করে রেখে যাব আমি। তোমার মেয়ে যা কিছু—"

কাতর অনুনয়ে ব্রজবাবু থামাইয়া বলিলেন, "যথেষ্ট, পায় পড়ি কান্তিদা, অমন সব কথা আর তুলো না। রাজী হচ্ছি আমি, চার বচ্ছর পুঁটীর বিয়ে স্থগিত রাখবো—"

"অবশ্য, নিজে থেকেই যদি না কোন ভাল সম্বন্ধ উপস্থিত হয়। তবেই বুঝলে ভায়া?"

"বুঝেছি দাদা। কেন ভাবছেন? ওসব মিছে!"

তারপর আরও কিয়ৎকাল কথোপকথনের পরে সে বেলার মত কান্তিবাবু ব্রজমোহনকে খাইবার নিমন্ত্রণ করিলেন। কিন্তু গৃহিনীর নিকট শুভ সংবাদগুলি দিবার জন্যে ব্রজমোহনের প্রাণ উতলা হইয়া উঠিয়াছিল।

অনেক করিয়া, অপর এক দিনের বরাত দিয়া, কান্তিদার পদ-ধূলি লইয়া ব্রজমোহন গৃহাভিমুখী হইলেন।

কিন্তু গৃহিনীকে এমন খবর দেওয়া সোজা কথা নয়। আকের যেমন রস নিঙড়ানো হয়, গৃহিনীও তেমনি ব্রজবাবুকে নিঙড়াইয়া নিঙড়াইয়া সারাটা দিন রাত্রি কেবলি এই শুভ সংবাদটীর রস আদায় করিলেন,—তার পরে আর যখন রস গলিল না, মন্তব্য করিয়া শেষ করিলেন—"আমিও তবে একবার যাবো; কালই, কি বল তুমি ?"

ব্রজবাবু বলিলেন, "অনুমতি তো দেওয়াই রয়েচে। আবার জিজ্ঞাসা কেন ?"

কথা শেষ করিয়া রাত্রিতে স্বামী স্ত্রী ঘুমাইবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু ঘুম কৈ, ঘুম কাহারও হইল না। উভয়েই উভয়কে ঠকাইতে লাগিলেন—যেন ঘুমাইতেছেন। চিন্তা, বিচিত্র বিচিত্র স্বপ্ন ও তন্দ্রায় সময় কাটাইতে লাগিল। প্রত্যূষে উঠিয়াই মাতঙ্গিনী ঠাকুরাণী তাড়াতাড়ি গৃহ কর্ম্ম সারিয়া স্বামী ও কন্যাকে খাওয়াইয়া, নিজে চারিটা মুখে গুঁজিয়া কন্যাকে অগ্রে অগ্রে লইয়া বাহির হইয়া পড়িলেন।

অন্দরের দ্বার হইতে তাহাকে দেখিয়াই কিরণের মা ছুটিয়া আসিয়া অভ্যর্থনা করিয়া ভিতরে লইয়া গেলেন। বিগতপ্রায় যৌবনা বিন্ধ্যবাসিনী ঠাকুরাণীর মুখের মধ্যে এমন একটা সরল হাসি ও উদারতার সুস্নিগ্ধ আভা স্বতঃই ফুটিয়া থাকিত যে, দেখিলেই তাহাকে ভালবাসিতে ও বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা হইত। মাতঙ্গিনী ঠাকুরাণীও এইটুকু অনুভব না করিয়া পারিলেন না। উভয়ের পূর্ব্বেও ঘনিষ্ঠতা

ছিল, এখন অতি সহজেই দীর্ঘ অদর্শনজনিত পার্থক্যটুকু ঘুচিয়া গিয়া আবার পূর্ব্বের নিতান্ত আপনার ভাব স্থাপিত হইল।

মাতঙ্গিনী ও অনিলা আহার করিয়া গিয়াছিলেন, কিন্তু বিন্ধ্যবাসিনী ছাড়িলেন না, আবার তাহাদের টানিয়া নিজের সঙ্গে খাওয়াইতে চাহিলেন। মাতঙ্গিনী অনুরোধ এড়াইতে অক্ষম হইলেন, কিন্তু অনিলা "কিরণদার সঙ্গে দেখা ক'রে আসি" বলিয়া পলাইয়া গেল। আহারে বসিয়া উভয় মহিলাতে কথোপকথন আরম্ভ হইল। তখন মাতঙ্গিনীর চেষ্টায় হোক বা যে কোন প্রকারেই হোক—অনিলার বিবাহের প্রসঙ্গটাও উঠিয়া পড়িল।

মাতঙ্গিনী নিজের সাংসারিক অবস্থার প্রসঙ্গ বলিতে বলিয়া ফেলিলেন, "কি আর করি বল, তবু না হোক্ নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপারগুলো কোনরূপে চলে যাচ্ছে, কিন্তু মেয়ের বিয়ে নিয়েই যত দুশ্চিন্তা। দেখতে দেখতে এত বড়টী হ'য়ে উঠলো; এখন পর্য্যন্ত—"

বাধা দিয়া বিন্ধ্যবাসিনী কহিলেন, "ষাট্ ষাট্ ওকথা কি বলতে আছে ভাই, কি আর বয়েসটা হয়েচে ওর? বাঙ্গালীর ঘরে ও রকম মেয়ে যে—"

মাতঙ্গিনী কহিলেন, "রয়েছে জানি। কিন্তু দিদি, তাদের শুধু মেয়ে নয়, সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গতিও যে বেশী রয়েচে!

এইবার বিন্ধ্যবাসিনী বলিলেন, "কাল রাত্রিতে কর্ত্তা বলছিলেন—" কিন্তু ঐটুকু বলিয়া অর্দ্ধেক পথে থামিয়া গিয়া আবার বিষয় বদলাইয়া বলিতে লাগিলেন, "কিন্তু থাক্, কর্ত্তাতে ও ব্রজবাবুতে কাল নাকি এ

বিষয়ে কি স্থির হয়ে গেচে—তোমাকে বলেনি? পুঁটীর ভার নাকি উনি নিয়েছেন এই রকম শুনলুম।”

মাতঙ্গিনী কর্ণ দু'টী ষোল আনা বিস্তৃত করিয়া কথাগুলি গিলিতেছিলেন, বিন্ধ্যবাসিনী এইরূপ থামিয়া যাইয়া ইঙ্গিতে দায়ীত্ব মুক্ত হওয়ার ক্ষুণ্ণ হইলেন। কিন্তু এই ইঙ্গিতের অন্তরালে যাহা আছে, মিত্র-গৃহিনীর মনে হইল, তাহার উপরও নির্ভর করা যাইতে পারে বটে। মেয়ের ভার বড় গুরুভার, স্বেচ্ছায় এ ভার অতি বড় ধনীও লইতে চাহে না। এ চাপ শুধু সেই সহিতে সাহস করে, যাহার ঘরে নিজের বিবাহযোগ্য ছেলে আছে।

নিজের মুখে বাহাদুরী করিয়া নিজের গৌরব ক্ষুণ্ণ করিতে কুণ্ঠিত হইয়াই যে বিন্ধ্যবাসিনী কথাটা বলিতে বলিতে এমন মধ্যপথে থামিয়া গেলেন, সে বিষয়ে আর মাতঙ্গিনী ঠাকুরাণীর সন্দেহ রহিল না।

আহার শেষে বসিবার ঘরে আসিয়া দুইটি মহিলা আবার বিশ্রম্ভালাপে নিযুক্ত হইলেন, তখন বিন্ধ্যবাসিনী ঠাকুরাণী আবার একটা কথা কহিলেন।

এটা ওটা অনেক কথার পরে বিন্ধ্যবাসিনী জিজ্ঞাসা করিলেন, “আচ্ছা, একটা কথা জিজ্ঞাসা কচ্ছি, দিদি স্পষ্ট উত্তর দিও। দেশে তো আমাদের তেমন জানা শুনা নেই, বন্ধুবান্ধব বল আত্মীয় স্বজন বল যা কিছু আমাদের পশ্চিমেই। আচ্ছা, মেয়েটার যদি সত্যই কিছু কুল কিনারা কর্ত্তে পারি, চিঠি লিখতেই লোক দিয়ে আমাদের কাছে পাঠিয়ে দেবে? তোমাদের সবাইর যেতে গেলে, অনেক খরচা তাই জিজ্ঞেস্ কচ্ছি ভাই।”

মাতঙ্গিনী মনে মনে ভাবিলেন এ ও একটা চাপা কথা। প্রকাশ্যে হাসিয়া কহিলেন, "তোমাদের মেয়ে তোমাদের হাতে ছেড়ে দেব দিদি আমাদের তাতে আপত্তি হবে কেন? তোমরা কি তার আমাদের চাইতে কম?"

সেই দিন আর বেশী কথা হইতে পারিল না। বেলা পড়িয়া আসিয়া অন্তঃপুরের অঙ্গনে দাঁড়াইয়াছে দেখিয়া মাতঙ্গিনী ঠাকুরাণী তাড়াতাড়ি বিদায় লইয়া খিড়কির দরজা দিয়া পলাইয়া গেলেন। আসিবার সময় বিন্ধ্যবাসিনী ঠাকুরাণী বার বার বলিয়া দিলেন—"আর একদিন এসো কিন্তু ভাই।"

"আস্‌বো বৈ কি দিদি" উত্তর দিয়া তাড়াতাড়ি ঘরে ফিরিয়া আসিয়া মাতঙ্গিনী একেবারেই ব্রজমোহনের কাছে হাজির হইলেন। অনুপস্থিতিতে একাকী বসিয়া ব্রজমোহন বাড়ী পাহারা দিতেছিলেন আর তামাক পুড়াইতেছিলেন স্ত্রীকে দেখিয়া প্রশ্ন করিয়া উঠিলেন— "কি?"

"আচ্ছা করে নিমন্ত্রন্ন খেয়ে এলুম আর গোয়েন্দাগিরিটাও কিছু করেছি বটে।"

"খবর ভাল?"

"বোধ হচ্ছে, এখন বরাতে সয় তো তবেই—" ব্রজবাবু অনুমতি করিলেন—"ভেঙ্গে বল।"

তখন যাহা যাহা কথোপকথন হইয়াছিল আনুপূর্ব্বিক গৃহিনী ভাঙ্গিয়া কহিলেন। শুনিয়া ব্রজমোহন কালভৈরবের বাড়ীতে একটা ভাল ডালি পাঠাইয়া ঘুষ বন্দোবস্ত করিতে উপদেশ দিলেন।

দুঃখের কথা চাপিয়া রাখা তত দুষ্কর নয়, কিন্তু সুখের কথা সহজে গোপন করিয়া রাখা যায় না। তাই, কথাটা বাহিরে প্রকাশ করা সঙ্গত নয় বুঝিয়াও, মাতঙ্গিনী ঠাকুরাণী অন্ততঃ একজনের নিকটে নিজের ভাবী সৌভাগ্যের কথাটা প্রকাশ করিয়া, ভারগ্রস্থ হৃদয়টা হাল্কা করিবেন, স্বামীরও অগোচরে এইরূপই একটা সাধু সঙ্কল্প করিলেন।

ও পাড়ার ধনঞ্জয় দত্তের স্ত্রী লীলাবতীর সঙ্গে ছিল তাহার—বন্ধুতা। উভয়েরই এক বয়স, তা ছাড়া মনের ধারাটাও উভয়ের নাকি এক—কাজেই উভয়ের মধ্যে অন্তরঙ্গটা বেশই জমিয়াছিল। বিন্ধ্যবাসিনীর সঙ্গে পূর্ব্বোক্ত সাক্ষাতের মাসখানেক পরে মাতঙ্গিনী একদিন ইহাঁরই সঙ্গে দেখা করিতে আসিলেন।

সইয়ের বাড়ী একটু দূরে, তাই ইচ্ছা সত্বেও সর্ব্বদা যাওয়া আসায় ব্যাঘাত ঘটিত। সেদিন রান্নাঘরে বসিয়া লীলাবতী মাছ কুটিতে কুটিতে দশম বর্ষীয় কন্যার সঙ্গে বকাবকি করিতেছিলেন এমন সময় মাতঙ্গিনী আসিয়া দ্বারে দাঁড়াইলেন। দেখিতে পাইলেন বহুদিন পরে সইকে দেখিয়া লীলাবতী অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া তাড়াতাড়ি বঁটী ফেলিয়া উঠিয়া চেঁচাইয়া উঠিলেন।

"বা রে, অমাবস্যায় যে চাঁদ ফুটলো, ব্যাপার কি? হঠাৎ যে বড় গরীবদের মনে পড়েছে! ও খুকী, আসন নে আয় শিগ্গির দেখসে কে এসেচে।"

বরের বাপ

লীলাবতীর কন্যা একান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও উননে কি একটা চড়াইবার ব্যবস্থা দেখিতেছিল, এই অসম্ভাবিত সুযোগ পাইয়া দৌড়িয়া একবারে দরজায় আসিয়া দাঁড়াইয়া, আবার আসন আনিবার জন্য গৃহাভিমুখে চলিয়া গেল। মাতঙ্গিনী হাসিতে হাসিতে তৎক্ষণে রান্না ঘরের মুক্ত মেজেতেই পা ছড়াইয়া বসিয়া পড়িলেন। তারপর কহিলেন, "আজ বিশেষ কাজকর্ম্ম নেই, তাই দেখতে এলুম। কর্ত্তা কোথায়?"

লীলাবতী একটু হাসিয়া কহিলেন, "জানো না? দেশোদ্ধারে লেগেছেন যে। মেয়ের বাপ হয়েছেন, বরের বাপের ঘাড় ভেঙ্গে পণপ্রথা উঠিয়ে দিয়ে দেশের উপকার কর্ত্তে হবে, তাই সভা সমিতি করে বেড়াচ্ছেন। যাক্, এখন তোমার কথা বল, কাজ কর্ম্ম নেই কেমন? আজ বুঝি ব্রজবাবু সকাল সকাল বেরিয়েছেন?"

"হাঁ, তাগাদায় গেছেন। জমীদারের ইজারার টাকা শিগ্গির শিগ্গির আদায় করে শোধ দিতে হবে।"

"ওঃ! তাই মনে পড়েছে। বুঝলুম ভাই! বলিয়া মেয়ের হাত হইতে আসনখানি লইয়া সম্মুখে যাইয়া আবার কহিলেন "উঠতো ভাই, পেতে দি। কাপড়চোপড়গুলো মাটীময় করে ফেলেছ যে!" মাতঙ্গিনী উঠিয়া সইয়ের হাত হইতে নিজেই আসনখানি লইয়া পাড়িয়া বসিলেন, তারপর মেয়েটির দিকে চাহিয়া কহিলেন, কি কচ্ছিলিরে খুকী, তুই তো বেশ রান্নাবাড়া কর্ত্তে শিখেচিস বোধ হচ্ছে। কৈ, কি কি রাঁধতে জানিস্ বলতো।"

লীলাবতী একটি ক্ষুদ্র দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—"কৈ আর

শেথাতে পাল্লুম দিদি, আর কি দশ বছর তো হ'লো। দুদিন পরেই পরের ঘরে যেতে হবে। এখনো না শিখলে শিখবেই বা কবে?"

মাতঙ্গিনীও একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, "ওকথা বলো না ভাই ওসব কথা উঠলে আমারো আর প্রাণে জল থাকে না। পুঁটীটাতো এই তেরো বছরে পা দিলে। কি যে হবে!"

লীলাবতী কহিলেন, "বিয়ের কিছু ঠিক্‌ঠাক্ হলো?"

মাতঙ্গিনী কহিলেন—"কৈ আর হলো? মেয়ের বে—সোজা কথা কি? ভেবে ভেবে তো দুজনেই সারা; যা হোক্, সেদিন কান্তিবাবু একটু ভরসা দিয়েছেন—তাই কিছু নিশ্চিন্ত আছি।"

বিস্মিত দৃষ্টিতে লীলাবতী মাতঙ্গিনীর দিকে চাহিলেন। কহিলেন, "সে কি লো, কিরণের সঙ্গে? বলিস্ কি?"

মাতঙ্গিনী একটু হাসিয়া বলিলেন, "বলো না ভাই, কাকেও বলো না। মেয়ের বে ভাঙচি দিতে লোকের অভাব নেই। বিশেষ কথাটা এখনো পাকাপাকি হয়নি, আরও শুন্‌চি দেরীও আছে বিস্তর—আর কেউ না জানে।"

লীলাবতী দাঁতে জিভ কাটিয়া কহিলেন, "ছি ছি, আমার ঘটে কি আর একটু বুদ্ধি নেই বুঝিনে কি আমি? এ সব কথা কি ঢোল পিটুতে আছে। সে ভয় করো না দিদি। ভগবানের ইচ্ছায় এখন মঙ্গলমতে কাজটি হয়ে যায়—হবেই ভাল। শুভকর্ম্মে শতেক বিঘ্ন। এর চেয়ে ভাল সম্বন্ধ আর কি হতে পারে! টাকা পয়সা কি নেবে?"

"দেব কোথেকে?"

"সে কি? বুঝবে কি ওরা? অবস্থা জানে?

"সব জানে দিদি—কর্ত্তা সব বলেছেন।"

"তবে কথাবার্ত্তা অনেকটা হয়ে গেচে। যাক্—ভারী সুখী হলুম। পুঁটীর এমন বর হবে—জেনেও সুখ দিদি। ভগবান কি নেই। এমন লক্ষ্মী মা-টী আমাদের, তার বর এমন হ'লেই তো তবে মানায়।"

গর্ব্বে মাতঙ্গিনীর হৃদয়টা ফুলিয়া উঠিল। কিন্তু বাহিরে সে ভাব প্রকাশ না করিয়া উত্তর করিলেন, "কিন্তু কথাটা তুমি আমি ও কর্ত্তা এই তিনটিমাত্র প্রাণী জানলে বোন্! শুভ কর্ম্মটার পাকাপাকি না হ'লে, দেখো যেন আর কেউ না শোনে! কি মাছ ও? সিং? বেশ দিব্যি বড় বড় মাছগুলো তো! আজ ভাই তোমার বাড়ী আমার নৈমন্তন্ন। কেমন—রাজী?"

লীলাবতী হাসিয়া কহিলেন, "মাছের খাতিরে? আমার খাতিরে নয়—বোঝা যাচ্ছে। আচ্ছা পেটুক যা হোক্—" তারপর মহাস্ফূর্ত্তিতে ছুটীয়া নূতন করিয়া রান্নার যোগাড় করিতে গেলেন। "খপদ্দার বাড়াবাড়ি কিছু কর্ত্তে পাবে না ভাই।" বলিয়া মাতঙ্গিনীও পিছনে পিছনে ছুটিলেন।

এইরূপে মেয়ের সৌভাগ্যের কথাটা আপনার একমাত্র বিশ্বাসী বন্ধুকে জানাইয়া, পেটটা অনেকটা হাল্কা করিয়া অপরাহ্নে মাতঙ্গিনী ঠাকুরাণী গৃহে ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন, মেয়ে তাহার সেই প্রস্তাবিত বরটীকেই গৃহে বসাইয়া বেশ আদর যত্ন করিয়া আলাপ জুড়িয়া দিয়াছে!

বয়ের বাপ

গৃহের বাহিরে কতক্ষণ অপেক্ষা করিয়া মাতঙ্গিনী ঠাকুরাণী কথোপকথন শুনিতে প্রয়াস পাইলেন।

অনিলা কহিতেছে, "আমার বড্ড দেশ দেখ্‌তে ইচ্ছে হয় কিরণ-দা। তোমাদের কি মজা। কত দেশ বিদেশ গাড়ীঘোড়া চড়ে, নানা সহর দেখে বেড়িয়ে বেড়াচ্ছ, আমি যদি তোমার মত হতুম!"

কিরণ হাসিয়া জবাব দিলেন, "আমার মত কি রকম? ব্যাটা ছেলে নাকি? বেশ বেশ—"

অনিলা নির্ব্বিচারে কহিল, "হাঁ, কিরণদা।" কিরণ এবার আরও উচ্চৈস্বরে হাসিয়া উঠিয়া কহিল—"হতে, তবে বুঝ্‌তে একবার মজাটা। স্কুলে যাও, পড়া মুখস্থ কর, মাষ্টারের বকুনি ও বেত্রাঘাত খাও—আরও কত কি! কেমন, মজা নয়? ব্যাটা ছেলে হলে আর এমন বসে বসে গল্পগুজব কর্ত্তে হতো না, আর এমন গা বাঁচিয়ে আরাম করে থাকাও চল্‌তো না।"

অনিলা একটু রাগতঃ ভাবে কহিল—"কিরণদা, তুমি বুঝি ভাব, আমরা কেবল কুড়ের মত বসে থাকি আর অন্ন ধ্বংস করি। তুমি খুব জানো কি না? আমাদের মত অত ঘর সংসারের কাজ কর্ত্তে পার্ব্বে?"

কিরণ কহিল "ওঃ! কি শুনি ওটা?"

"রাঁধ্‌তে পার্ব্বে?"

কিরণ কহিল, "ও আবার একটা কাজ নাকি? আরে দূর্ দূর্! চাট্টে চাল আর ডাল, আর একটু নুন আর লঙ্কা—ব্যাস্ এক সঙ্গে করে একটু জল দিয়ে উননে চড়িয়ে দাও—হয়ে গেল! ওরান্না তিনবার রেঁধে সকলকে খাওয়াতে পারতুম্।"

অনিলা কহিল, "আমাদের মত ঘর নিকানো, মসলা বাটা, তরিতরকারী কুটা—এগুলো পার্ব্বে ?"

কিরণ কহিলেন, "হাঁরে পুঁটী, তুই কেমন রাঁধ্‌তে জানিস্ রে ? আচ্ছা, একদিন রেঁধে এক্‌জামিন দে দেখি।"

অনিলার মুখ অন্ধকারময় হইয়া গেল। কিরণকে খাওয়াইবার মত সামর্থ্য তাদের যে কত কম—তাহা বালিকা হইলেও সে বুঝিত। তাই একটু থতমত খাইয়া বলিল—"বেশ তো।"

কিরণ এ ভাবটা লক্ষ্য করিয়াই কহিল, "মুখে 'বেসতো' বল্লে বটে, কিন্তু অন্তরে যেন ঠিক তা নয়। মুখ দেখেই বুঝেচি—যা তুমি রাঁধ্‌তে জানো তা ওতেই প্রমাণ হচ্চে।"

উপায়ান্তর না দেখিয়া অনিলা বলিয়া বসিল, "যাও—যাও—সে জন্যে বুঝি ? আমরা যে বড্ড গরীব!"

অনিলা এমন করিয়া কথাটা বলিল যে, কিরণকে সে সেটা অত্যন্তই বিঁধিল, তাহা বাহিরে থাকিয়া মাতঙ্গিনী ঠাকুরাণীরও বুঝিতে বাকি রহিল না। তাই ঘরে না ঢুকিয়াই অতঃপর কিরণ কি জবাব দেয়, তাহাই জানিবার জন্য তিনি আগ্রহভরে আরও কতক্ষণ বাহিরেই দাঁড়াইয়া রহিলেন।

কিরণ কহিল, "গরীব—তা কি ? গরীবের বুঝি কাকেও খাওয়াতে নেই—ছোটবেলাকার সাথীদেরও না !"

অনিলা উচ্চৈস্বরে হাসিয়া কহিল, "আচ্ছা কিরণদা, গরীব বলে তুমি আমাদের ঘৃণা কর না। এবার যখন এলাহাবাদ যাবে, আমাদের মনে রাখ্‌বে ?"

কিরণ কহিল, "কেনরে, এবার আমার খুব মেজাজটা উঁচু হয়ে যাবে নাকি? এতদিন মনে রাখলুম, আর এবার রাখবো না— একথা ভাবচিস্ যে?"

অনিলা হাসিয়া কহিল "না জিজ্ঞাসা কল্লুম, কিন্তু তখনই আবার প্রশ্ন করিয়া বলিল. "কেন বল্লুম জানো?"

কিরণ বলিল, "কেন?'

অনিলা কহিল, "একটুখানি কারণ আছে বৈকি কিরণদা। এই তো সাত বচ্ছর পরে এবার তোমরা দেশে এলে, আবার হয়তো আর সাত বচ্ছর কাটিয়ে ফিরবে তদ্দিনে যে অনেক কাণ্ড হয়ে যাবে।"

"কি কাণ্ড শুনি?"

"তুমি পাশ দেবে, চাকুরী কর্ব্বে, বে হবে—তোমার আরও কত —কত কি—আর আমাদের মনে রাখ্বে?"

কিরণ এবার হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। কহিল, "বটে? বে হবে আমার?"

অনিলা কহিল, "হবে বৈকি? বে কার না হয়? সেদিন মাসীমা বল্ছিলেন, তাঁর শরীর ভাল নয়, ২।৪ বছরের মধ্যে একটি বউ ঘরে আনতে হবে—তা বুঝি শোননি?"

কিরণ আপশোসের স্বরে বলিয়া উঠিল, "দু'চার বচ্ছর! ওঃ!"

অনিলা কহিল, "তর সইবে না বুঝি?"

কিরণ কহিল—"কি করে সয়? আচ্ছা, তোকেই জিজ্ঞাসা করি পুঁটী, তোকে হারিয়ে এবার যে এলাহাবাদে যাবো—গিয়ে একটা

খেলার সাথীও না পেয়ে কি করে সময় কাটে বল দেখিনি; একটু শিগ্গির শিগ্গির বিয়েটা হতো, তো সেইটে পূরণ হতো।"

অনিলা উচ্চকণ্ঠে চেঁচাইয়া বলিল, "বল কি কিরণদা?"

কিরণ কহিল, "আর বলি কি? মনের মত খেলার সাথী না হলে সময় কাটে না, তা আমি বুঝেছি এবার।"

অনিলা এবার একবারে হাসিয়া গড়াইয়া পড়িয়া উত্তর করিল, "এর মধ্যেই মনেরমতটাও হ'য়ে গেল। দেখা নেই—সাক্ষাৎ নেই তবু—"

কিরণ তাচ্ছিল্যের সহিত কহিল, "তা নেই—নেই। ওতে আট্কায় না। বৌ তো? বৌ কি মনের মত না হয়ে যায়?"

অনিলা বিস্মিত ভাবে কহিল, "অবাক্ কল্লে!"

এমন সময় মাতঙ্গিনী ঠাকুরাণী সশব্দে গৃহে প্রবেশ করিলেন। হাসি ঠাট্টা বন্ধ হইয়া গেল। তাহাকে দেখিয়া কিরণ ও অনিলা উভয়েই তাড়াতাড়ি সাম্লাইয়া লইতে ব্যস্ত হইল। মাতঙ্গিনী কোন প্রকারে হাসি চাপিয়া সহজ কণ্ঠে কহিলেন—"কিরণ যে! কখন এলে বাবা?"

কিরণ এবার উঠিয়া বেশ শিষ্ট বালকটি সাজিয়া কহিল, "কোথায় গেছলে মাসীমা? আমি যে কখন থেকে তোমার জন্য এসে অপেক্ষা করে বসে আছি। মা তোমায় কাল নেমন্তন্ন করে পাঠালে।"

মাতঙ্গিনী কহিলেন, "আর কেন বাবা? তোমাদের উপকার পেয়ে ঋণের বোঝা যে বড্ড ভারি হয়ে যাচ্ছে। এতটা বেড়ে গেলে, সইতে পার্বো না যে বাছা?"

কিরণ 'চট্‌পটে' ছেলে। বলিয়া বসিল, "মাসী মা—তুমি আমায় বোকা বানাবার জন্যেই এ কথাটা বল্লে। পালাব তবে, বলে দিলুম।"

মাতঙ্গিনী হাসিয়া কাঁধে ধরিয়া তাহাকে একটা আসনে বসাইয়া কহিলেন, "বোস্ বাছা, পাগলামো করিস্‌নি। বোনটী যখন স্মরণ করেছে, তখন কি আর না যেয়ে পারি—যাবো বৈ কি? আর আমার তো ওই সাধ। কিন্তু অবস্থায় মেরে রেখেছে। একটু যে পাল্টা জিজ্ঞাসা কর্ব্বো—তারও উপায়টি নেই। ওরে পুঁটী তোর দাদার জন্যে কি জলখাবার তৈরী কর্ব্বি বল্‌তো?"

কিরণ জলখাবারের নাম শুনিয়াই দুই লম্ফে বারান্দায় যাইয়া চেঁচাইয়া উঠিল, "না, না তাড়িয়ে আর ছাড়লে না দেখ্‌চি। বাড়ী থেকে খেয়ে পেটটা টুম্বুস্ করে এসেচি, আবার কি না বল্‌ছো এখানে খেতে হবে। মাসীমা—তবে চল্লুম তবে।"

কিরণ চলিয়া যায়, মাতঙ্গিনী দৌড়িয়া যাইয়া কোনরূপে তাহাকে ফিরাইয়া আনিলেন। কিরণ ফিরিয়া আসিয়া বিছানায় বসিয়া—সাবধান করিয়া দিল, "ফির্‌লুম, কিন্তু আবার যদি খেতে বল্‌বে তো শুন্‌তে পার্‌বো না কিছুতে—বলে দিলুম।"

মাতঙ্গিনী বলিলেন—"আচ্ছা আচ্ছা তাই হবে। ভাবিস্‌নি। গরীবের মুড়ি মুড়কি বৈ তো নেই বাবা। কি দিয়েই বা অত জেদ করি।"

কিরণ অপ্রস্তুত হইল। "মাসীমা আচ্ছা জব্দ কর্‌লে যা হোক্।" কিছুক্ষণ চুপ করিয়া ভাবিয়া সে বলিল—"মাসীমা তুমি ছাড়লে না।

বোঝাই পেটটাকে আরও একটু বোঝাই কর্ত্তে হলো দেখচি। আন্ পুঁটী কোথায় তোদের মুড়িমুড়কি না কি আছে। দেখি—যতটা পারি ঠেলেঠুলে একবার।”

শিকায় তোলা হাঁড়িকুড়িগুলার নিকটে যাইয়া কিরণ হাজির মাতঙ্গিনীও অনিলাও হাসিতে হাসিতে সঙ্গে সঙ্গে গেলেন।

একটা কলসী হইতে কিছু মুড়কি ও নারকেলের লাড়ু বাহির করিয়া থালায় দিতেই, কিরণ চেঁচাইয়া বলিয়া উঠিল—“আবার লাড্ডু কেন! খাব না বল্‌চি এর কোন কথা ছিল না তুলে রাখো।”

দুমুঠো মুড়কি তাড়াতাড়ি মুখে গুঁজিয়া দুই লম্ফে অতঃপর সে বাহিরে যাইয়া দাঁড়াইল। “পাগল কোথাকার” বলিয়া হাসিয়া মাতঙ্গিনী জলের গ্লাসটি লইয়া পিছনে পিছনে ছুটিলেন।

কিন্তু কিরণ চলিয়া গেলে সেদিন মাতঙ্গিনী অনেকক্ষণ বসিয়া বসিয়া এই দিনকার ব্যাপারগুলির কথা চিন্তা করিলেন।

এত ঘণিষ্ঠতার পরিণাম কি? আশা ও আশঙ্কা দুইটা জিনিষই তো দুপাশ ঘিরিয়া কয়দিন যাবৎ তাহাকে অতিষ্ঠ করিয়া তুলিয়াছে। আহার নিদ্রায়, বিশ্রামে সাংসারিক কাজ কর্ম্ম—কোন সময়েই রেহাই নাই। কিন্তু কাহার উপরে নির্ভর করিয়া তিনি দ্বিধা শূন্য হইতে পারেন? একবার বিশেষ করিয়া মেয়ের দিকে আজ মাতা চাহিয়া দেখিলেন,—সরলা অপ্রাপ্তযৌবনা বালিকার মুখের উপরে বা চলা-ফেরার ভিতরে এতটুকু দাগ নাই। সে যেমনি হাসি খুসী করিয়া চিরকাল খেলিয়া বেড়াইয়াছে, রঙ্গরস করিয়াছে, আজিও তেমনি প্রীতি প্রফুল্লভাবে এদিক ওদিক ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, সঙ্কোচ বা দ্বিধার

এতটুকু ছায়া কোথাও নাই। অন্তরের কোন স্থান, ভবিষ্যৎ চিন্তা-ভারে এতটুকু ক্লিষ্ট দেখাইতেছে না।

মাতঙ্গিনী একটা দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন, তারপরে অস্ফুটে কহিলেন। "মা কালী, এ দুরাকাঙ্ক্ষা কি আমার পূরণ হবে? দোহাই বাবা কাল ভৈরব। এ স্বপ্ন যেন স্বপ্নেই শুধু শেষ হয়ে না যায়। দেখো বাবা।" তারপর গৃহ কর্ম্মে চলিয়া গেলেন।

(৫)

কিন্তু মাতঙ্গিনী ঠাকুরাণী একটা সতর্কতা অবলম্বন না করিয়া পারিলেন না। কিরণের সহিত মেয়ের সে দিনকার কথাবার্ত্তায় মনে মনে কিন্তু ভাবিলেন, এ রকমটা সুশোভন নয়। অবশ্য মেয়ে বা বাহিরে কেহ যে এ বিষয়টা সহজে জানিতে পারিবে, এ আশঙ্কা ছিল না, কিন্তু দুদিন পরে বাস্তবিক যাহার সঙ্গে বিবাহ হইবে, তাহার সঙ্গে, বাঙ্গালীর পরিবারে অতটা, বাড়াবাড়ি ভাল নয়—ইহাই তাঁহার মনে হইল! কন্যাকে তিনি বিশেষ কিছু বুঝিতে না দিয়া একদিন কিন্তু বলিয়া বসিলেন, 'মা. বড় হয়েচ, ব্যাটাছেলের সঙ্গে অত কথাবার্ত্তা কইতে নেই, দু'দিন বাদে কোণের বউ হবে।" কন্যা একটু প্রশ্ন করিল,

"কি করেছি?"

মাতা আরও একটু স্পষ্ট ইঙ্গিত করিবার জন্য বলিলেন, "ওই কিরণের কথা বল্‌ছি মা, সেদিন ওর সঙ্গে কতকি বক্‌ছিলে, মুখে কিছু না বল্লেও মনে মনে হয়ত সে কি মনে কচ্ছে। ওদের সঙ্গে অতবেশী হাসি ঠাট্টা কর্ত্তে নেই।"

অনিন্দ্যা অবাক্। মার নিকট হইতে এমন কথা শুনিবে সে ইহা কোন দিনই আশাও করে নাই। কিরণের সঙ্গে সে তো চিরকালই এ ভাবে মিশিয়া আসিয়াছে, চিরকালই তো উভয়ের মা

বাপ এ বিষয়ে কোন কথা কহেন নাই। তবে আজ এ কথা কেন? যাক্, কথা যখন হইয়াছে, তখন অনিলা একটু সতর্ক হওয়াই যুক্তি-যুক্ত মনে করিল। সে কিরণের নিকটে অতঃপর কিছু গম্ভীর হইয়া গেল।

কিন্তু কিরণ ইহাতে বাঁকিয়া বসিল। কিরণ সর্ব্বদা অনিলাদের বাড়ী যাওয়া আসা করে, সর্ব্বদা উভয়ে দেখা সাক্ষাৎ হয়, গল্পগুজব করে, দশপঁচিশ খেলে, মুড়িমুড়্কি খায়, কিন্তু হঠাৎ একদিন লক্ষ্য করিল, তাহাদের সে সব মেলা মেশা হইতে হাসি ঠাট্টাগুলি যেন অন্তর্ধান হইয়া গিয়াছে, ব্যাপারটার কারণ নির্দ্দেশ করিতেও কিরণের গৌণ হইল না। অনিলার দোষেই যে এই ব্যাপারটা ঘটিতেছে, তাহা সে নিজের নিকটে দিব্য করিয়া বলিতে লাগিল, আর কেবলি মনে মনে গুমরাইতে লাগিল। কেন এটা হইল? অনিলা কেমন এক রকম চুপ মারিয়া গিয়াছে। সে না বলে তেমন নিসঙ্কোচে কথাবার্ত্তা, না তেমন তাহার সাম্‌নে আসিয়া হাসি কলরব করিয়া—বসে, না তাহাকে আর তেমন থাকিবার বা খাইবার জন্য পীড়াপীড়ি করে। প্রথম প্রথম সে একটু ক্ষুণ্ণ ও অপ্রতিভ হইল, কিন্তু দু'চার দিনের মধ্যেই সে বুঝিল, অনিলা তাহার উপর রাগ বা অভিমান করে নাই। বালিকাসুলভ লজ্জা বা সঙ্কোচের বশেই সে এইরূপ করিতেছে। কিন্তু যে জিনিসটা এতকাল সম্পূর্ণই গা ঢাকা হইয়াছিল, হঠাৎ সে এখন এমন প্রবল ভাবে আত্মবিকাশ করিল কেন—সেই তো সমস্যা।"

কিরণ প্রথমে অনিলার মায়ের নিকটই নালিশ উত্থাপন করিল,

কিন্তু বিশেষ কোনও ফল হইল না। কিরণ দেখিল, মাতঙ্গিনী তাহাকে মধুর ও প্রবোধ বচনে অনেকটা শান্ত ও আপ্যায়িত করিলেন বটে, কিন্তু কন্যাকেও তিনি বিশেষ কোনও শাসনের কথা কহিলেন না। ক্ষুণ্ণ হইয়া কিরণ শেষে তাহার মায়ের নিকট দুঃখটা জানাইল। কিরণের তাহাতে বুক ভরিয়া একটা অভিমান ও নিরাশার দীর্ঘ নিশ্বাস উঠিল। বিন্ধ্যবাসিনী বলিলেন—"ওর কাছে আর এখন তেমন করে যাওয়া আসা কর্ত্তে নেই বাবা! মেয়েটী বড় হয়ে উঠেচে। ওর বিয়েরও কথাবার্ত্তা চলছে।"

আশ্চর্য্য! কিরণের এ কথাটা এ পর্য্যন্ত এক দিনও মনে হয় নাই। কিন্তু মনে না হউক, সতের বৎসরের বালকের অভিজ্ঞতার চেয়ে প্রাণের আবেগ বেশী। অনিলার সহিত এ কয় দিন মিলিয়া মিশিয়া সে যে আনন্দ পাইয়াছে, এখন এক দিনের এই একটী কথায় তাহাকে পরিত্যাগ করা নিতান্তই দুর্ঘট বলিয়া মনে করিল। কিরণ ভাবিল বিয়ে হবে হোক্, কিন্তু তার জন্যে এমন করিয়া তাহাকে দূরে ছুড়িয়া ফেলিয়া দিবার কি আবশ্যকতা? বিয়ে সকলেরই হয়, কিন্তু ভাই বোনের সম্পর্কটাও তো চিরকালই থাকে। দু'দিন বাদে যাহার সহিত একেবারেই বিচ্ছিন্ন হইবে, তাহাকে যে এ দুদিন আরো একটু বেশী আদর যত্নই করা উচিত। কিরণ এইরূপ আরও কত কথা ভাবিতে লাগিল; কিন্তু শেষটা সে এমত আশাও করিল, অন্ততঃ ২।৪ দিন ওদিকে যাওয়া আসা না করিলে অনিলা তাহার অপরাধটা বুঝিতে পারিয়া আবার তাহাকে নিশ্চয়ই খোসামোদ করিয়া ঘরে লইয়া যাইতে আসিবে।

কিন্তু এ আশাও তাহার ধূলিস্যাৎ হইয়া গেল। অনিলা আসিল না, আসিলেন এক দিন মাতঙ্গিনী ঠাকুরাণী নিজে। মাতঙ্গিনী অনেক অনুযোগ করিয়া, অনেক পীড়াপীড়ি করিয়া তাহাকে পুনঃ নিজের আলয়ে লইয়া গেলেন সত্য, কিন্তু কিরণের তাহাতে জ্বালা বাড়িল বৈ কমিল না। অনিলা তেমনি তাহার দূরে দূরে রহিল, কিরণ একবার তাহার সহিত শেষ বোঝাপড়া করিবার জন্য সুযোগ খুঁজিতে লাগিল।

সুযোগ অবশ্য মিলিল। মাতঙ্গিনী ঠাকুরাণী ভাবটা বুঝিয়াছিলেন, বাসনপত্র ধুইবার ছলা করিয়া সেদিন তিনি পুকুরে চলিয়া গেলেন। ব্রজবাবু এ সময়টা বাড়ী থাকেন না, আজও বাহির হইয়াছিলেন ; কিরণ দেখিল কেহ কোথাও নাই, বেশ নিরিবিলি। পান চিবাইতে চিবাইতে মনে অনেকগুলি কথা শাণাইয়া অনিলার ঘরে ঢুকিয়া সে দেখিল, একটা জানালার নিকটে কি একটা পুথি খুলিয়া লইয়া সে তন্মধ্যে ষোল আনার উপরেও মনটা ঢুকাইয়া দিয়া বসিয়া আছে।

কিরণ কহিল—"কি খবর ?"

একবার চারিদিকে চাহিয়া গম্ভীরভাবে অনিলা কহিল—"কি কি কিরণদা ?"

"বিয়ের কথা শুনে একবারে যে সুবোধ লক্ষীটী বনে গেলে। বলি, আমারও বিয়ের কথা উঠে, অমন বরফ জমে যাই কি ?"

অনিলা ভাবিল "এ কি অভিযোগ !" কিন্তু—কিরণদার মুখে বিয়ের কথা শুনিয়া আজ তাহার লজ্জা করিতে লাগিল। কতক্ষণ শব্দ করিতে পারিল না। কিরণ লক্ষ্য করিল, জানালার আলোক

আসিয়া তাহার গণ্ড স্থলের যে স্থানটীতে পড়িয়াছে, উহা লালে লাল। তাড়াতাড়ি নিকটে যাইয়া হাত হইতে বইখানি টানিয়া ফেলিয়া দিয়া জোরের সহিত কহিল—"ও এখন থাক্, বৌ হতে চাস্, এর পর হোস্ এখন, ঢের সময় আছে। এখন একবার আগের মতটী হ, দেখি—"

কথাটা সমাপ্ত না হইতেই অনিলা সলজ্জ মৃদু হাসিয়া চাপা গলায় আস্তে আস্তে কহিল—'ছি, কিরণদা, কি কচ্ছ, বড় হয়েছি, এখন যে অত হাসি ঠাট্টা ভাল দেখায় না? একটু ভাল হয়ে—"

অনিলাও হঠাৎ থামিয়া গেল। কিরণ কিন্তু আমোদ অনুভব করিতেছিল—এই বার কহিল—"থাম্লি কেন, বল্ না? বৌ না হয় তুই-ই হতে যাচ্ছিস্, আমি তো আর হচ্ছিনে, আমার তবে এত দায়? আচ্ছা রোস্, মাকে বলে দিচ্ছি—"

অনিলা ভয় পাইয়া গেল। বলিল—"তোমার পায়ে পড়ি কিরণ-দা; অমন কাজ কখ্খনো করো না। লজ্জায় মরে যাবো। ছি, ছি!" এমন সময় মাতঙ্গিনী ঠাকুরাণী ঘাট হইতে ফিরিতেছেন, তাঁহার বাসন পত্রের টুং টুং শব্দ কানে আসিল। অনিলা তাড়াতাড়ি 'ওই মা আস্চে' বলিয়া দুই লম্ফে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। "পুঁটিটা যে আজ ভারী সেয়ানা হয়েচে, কিন্তু পালালো কেন?" ভাবিতে ভাবিতে কিরণও হতবুদ্ধি হইয়া রহিল।

ইহার পর কয়েক মাস চলিয়া গেল। কান্তিবাবু সপরিবারে পশ্চিম গিয়াছেন। গ্রামখানি পূর্ব্বের ন্যায় আবার—নীরব নিঝুম—মন্থর গতিতে চলিয়াছে। কেবল মধ্যে মধ্যে ধনঞ্জয়বাবুর উদ্যোগে 'পণপ্রথা নিবারণী' সভাটা গা—ঝাড়া দিয়া পল্লীর এই আলস্যটা একটু একটু ভাঙ্গিয়া দিতেছে।

কিছুকাল পরে এই 'পণপ্রথা নিবারণী' সভাটারও কিন্তু একটা জড়ত্বের আবির্ভাব দেখা গেল। প্রকাশ্য কারণটা ধনঞ্জয়বাবুর অত্যধিক প্রবল উৎসাহে দেশের লোকের পা ঠিক রাখিয়া চলিবার অক্ষমতা। কিন্তু ইহার প্রকৃত ও নিগূঢ় কারণটা সকলে জানিত না, কিন্তু নানা কারণে ২।১ জনের কাণে শেষটা বিষয়টা পৌঁছিয়াছিল। এই সম্পর্কে ধনঞ্জয় বাবুর বাড়ীতে একদিন যে তাহাদের স্বামী স্ত্রীর মধ্যে একটা আলোচনা চলিতেছিল, সেইটা পাঠকের জানা কর্ত্তব্য।

ধনঞ্জয়বাবু লোকটা নিতান্ত মন্দ বা অসৎ প্রকৃতির ছিলেন, এ কথা বলা যাইত না। কিন্তু নিজের স্বার্থের পথে পরের স্বার্থ পড়িলে তিনি নির্ব্বিচারে তাহাকে পায়ে ঠেলিয়া পথ পরিষ্কার করিয়া লইতে পারিতেন—এ বিশেষত্বটুকু তাঁহার চরিত্রের ছিল। ইহা লইয়াই মধ্যে মধ্যে পাড়া প্রতিবেশীর সঙ্গে ঝগড়া বিবাদগুলা বিশেষ একটা শিকড় বাঁধিয়া—উঠিতে পারিত না। কিন্তু এই লীলাবতী ঠাকুরাণীরও

একটা রোগ ছিল। কেমন তাঁহার স্বভাব তিনি কাহারও কোন ভাল খবর পাইলে সেটাকে যেন ঠিক তাহার নিজেরই কোন সৌভাগ্যের কথা—এইরূপ মনে করিয়া লইতেন, আর তাহার খোলাখুলি মনটীতে নিজের কোন ভাল কথা যেমন গোপন করিয়া রাখিতে পারিতেন না, পরের কোন আনন্দের ব্যাপার উপস্থিত হইলেও সেইরূপটাই করিয়া বসিতেন। মাতঙ্গিনী ঠাকুরাণীর এত কথা এত সতর্কতা সত্বেও কয়েক মাস পরে কথাটা তিনি স্বামীকে অন্ততঃ বলিয়া ফেলিলেন। ধনঞ্জয়বাবু শুনিয়া চমৎকৃত হইয়া গেলেন। বিষয়টা লইয়া স্বামী স্ত্রীর মধ্যে যে কথাবার্ত্তা হইল তাহার একটু নমুনা দিতেছি।

স্বামী। বল কি গো, কে বল্লে ?

স্ত্রী। সই নিজেই একদিন বলে গেছে।

স্বা। দূর্ কথাটা তা হলে আমার কাণে পৌঁছাতো।

স্ত্রী। বড্ড গোপন যে। কাকেও বল্‌তে আমাকেও সে বারণ করে গেছলো। দেখো তুমি কিন্তু আবার কাকেও বলে বসো না।

স্বা। আমার বিশ্বাস হয় না। আচ্ছা এত গোপনই বা কিসের ?

স্ত্রী। গোপন হবে না ? মেয়ের বে যে! তারপর এমন একটা সম্বন্ধ, যদিই কেউ শত্রুতা করে।

স্বামী। বিয়ে ভেঙ্গে দেয় ?

স্ত্রী। তা বৈ কি ?

স্বামী। তাতে না হয় মেয়ের দিকেরই লোক্‌সান বুঝলুম ; কিন্তু পাত্রপক্ষের ? তাঁরা গোপন রাখ্‌চেন কেন ?

স্ত্রী! তাঁরা গোপন রাখ্‌চে কি না রাখ্‌চে, তা আমি জানি নে।

ধনঞ্জয় বাবু হাসিয়া উঠিলেন, কহিলেন, "তুমি জানো না, কিন্তু আমি জানি। কথাটা যদি বাস্তবিক সত্যি হয়, তবে তাঁরাও রাখ্‌চেন। নতুবা ঠিক জেনো, আমার কাণে কথাটা আস্‌তো। কিন্তু কাণে যখন কথাটা আসে নি—আমার মনে হয় লীলা, কথাটা মিথ্যে।"

লীলাবতী বিস্মিতভাবে বলিলেন, "কি বল্‌ছো বুঝতে পাচ্ছি না।"

"কান্তিবাবু এমন একটা সম্বন্ধ কখ্‌খনো কর্ব্বেন না—কর্ত্তে পারেন না। পণপ্রথা নিবারণী সভার সভাপতি আমি, আমি সবাইকে চিনি। যদিবা কর্ব্বেন, এটা গোপন রাখায় তার কোন সার্থকতা নেই।"

"কেন?"

"বল্‌চি। বরের বাপ তিনি, বরের উপর পণের দাবী ছাড়্‌তে রাজী নন তা আমি জানি। কথাটা প্রকাশ হলে, মেয়ের বাপের প্রতিযোগীতায় পড়ে হয়ত তার এ পণের টাকাটা আরো বেড়ে যেতে পার্ত্তো—এটা সকলেই বোঝে।"

লীলাবতী এতক্ষণে বুঝিলেন, বুঝিয়া হতবুদ্ধি হইয়া রহিলেন। স্বামীর এই অকাট্য যুক্তির বিরুদ্ধে তাঁহার আর কি বলিবার থাকিতে পারে ভাবিয়া পাইলেন না।

কিন্তু ধনঞ্জয় বাবু আবার কহিলেন, "কিন্তু আমি খবর নেবো! পণপ্রথা নিবারণী সভার সভাপতি আমি আমার যে ওটা কর্ত্তব্যের মধ্যে।"

লীলাবতী চমকিয়া উঠিয়া কহিলেন, "না না, এটা নিয়ে তোমার আর কর্ত্তব্য জানাতে হবে না। সই অনেক করে নিষেধ করে গেচে—"

কিন্তু ধনঞ্জয় বাবু আশ্বাস দিয়া কহিলেন—"তোমার সই কিছু না জান্‌লেই হলো, নিশ্চিন্ত থাক বাইরেরও লোকে কিছু খবর পাবে না।"

লীলাবতী সন্তুষ্ট হইতে পারিলেন না। বাইরের লোকে খবর পাইবে না, অথচ স্বামীটা তাহার খবর লইবেন এ যে কি, ভাল বোঝা গেল না। কিন্তু স্বামীর উপর বেশী একটা জোরের কথাও তাঁহার মুখ দিয়া বাহির হয় না। অগত্যা বলিলেন—"খবদ্দার দেখো—"

স্বামী অভয় দিয়া কহিলেন—"হ্যাগো হ্যা, দেখো কেন

(৭)

কিরণ অনিমাকে যে কথাটা বলিয়াছিল তাহা কতকটা ঠিক। এলাহাবাদ আসিবার পরে কতক কাল তাহার মোটেই ভাল লাগিল না। মনটা কেমন কেমন করিতে লাগিল। দেশে যাইবার পূর্ব্বে সহর ছাড়িয়া যাইতে তাহার কিন্তু মোটেই আগ্রহ ছিল না; কিন্তু ফিরিয়া আসিয়া মনটা তাহার এবার অন্যরূপ বলিতে লাগিল। এলাহাবাদ অপেক্ষা এখন দেশের আকর্ষণটা তাহার নিকট ঢের বেশী—মনে হইতে লাগিল।

কিন্তু কথাটা শুধু বোধ হয় ভৌগলিক সমস্যা মূলক নয়। ইহার গোড়ায় আর একটা বড় কথা ছিল। তাহার অন্তর মধ্যেও ইতি মধ্যে একটা—যুগ-প্রলয় হইয়া গিয়াছিল। এতকাল তাহার অন্তরটা শুধু তাহাকে লইয়াই পরিপূর্ণ ছিল; কিন্তু এখন ঢিলে জামার মত সেখানে অসংখ্য জায়গা খালি দৃষ্ট হইল।

ঢিলে জামাটা লইয়া স্বচ্ছন্দে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ চলে না। কিরণের কেমন মনে হইতে লাগিল, ঐ ফাঁকা জায়গাটা পূরণ করিবার জন্য একটা কিছু চাই—নিশ্চয় চাই। দেশে যতকাল ছিল এ জায়গাটা কিসে যেন ভরিয়া রাখিয়াছিল, যাই এলাহাবাদ আসিয়াছে সেটা যেন হঠাৎ হারাইয়া গিয়াছে। কি করা যায় এখন।

দুধের আশা কিরণ ঘোলে মিটাইবার ব্যবস্থা করিল। রাস্তায় যাইতে যাইতে ২।১টা বাঙ্গালীর মেয়ে দেখে আর সে হাঁ করিয়া

দাঁড়াইয়া যায়—ঠিক ওই পুঁটীটার মত না? মানুষে মানুষে সাদৃশ্যের অভাব নাই, হিন্দুস্থানীর দেশে বাঙ্গালীর মেয়ে বেশী নজরে পড়ে না, কিরণের সন্দেহ থাকে না হাঁ—হাঁ সেই রকমই বটে। কিন্তু আলাপ হয় কি করিয়া?

অধ্যবসায়ের মার নাই। একদিন দুদিন তিন দিন দু মাস ছ মাস ন মাস পরে আবার একদিন সুযোগ উপস্থিত হইল। কিরণ একদিন সহপাঠীর সঙ্গে তাহাদের বাড়ীতে যাইয়া দেখিল, সে বাড়ীতে দিব্য একটী বড়সড় মেয়ে! সে তাহার সম্মুখেও বাহির হয়, জিজ্ঞাসা করিলে দু'চারটা কথাও বলে, আর অধিকন্তু—এটা তার আশা বা আকাঙ্ক্ষার মধ্যেই ছিল না—অদূরে বসিয়া তাহাকে দেখাইয়া এবং শুনাইয়া হারমোনিয়াম বাজাইয়া গানও গায়।

কিরণ বন্ধুটীর সঙ্গে উঠিয়া পড়িয়া ঘনিষ্ঠতা করিতে লাগিয়া গেল এবং তাহার চেষ্টাটাও আশ্চর্য্য গতিতে ফলবতী হইতে লাগিল। মেয়েটী ২।৪ দিনের মধ্যেই তাহার সঙ্গে খোলাখুলি কথা বলিতে লাগিল এবং কয়েকদিন পরে বন্ধুটীর (মেয়েটী তাহার ভগ্নী) মাতাও তাহার সম্মুখে দেখা দিতে লাগিলেন। তার পর, ভক্তি ভালবাসা, আদর আপ্যায়ন, সমাজিক আলোচনা, গানের বৈঠক, চা-পান প্রভৃতি একটার পর একটা দেখিতে না দেখিতে গজাইয়া উঠিতে লাগিল। এমন কি শেষটা মান-অভিমান নামক পরম পদার্থ দুইটাও আত্মচিন্তা করিবার লক্ষণ জানাইল।

এই অবস্থায় যখন কতকাল ব্যাপারটা অগ্রসর হইয়াছে, তখন একদিন হঠাৎ ভগবানেরই আর একটা সনাতন আইনে

বরের বাপ

আর একটা বিভ্রাট আসিয়া পড়িল। একদিন কান্তিবাবু বাহির হইতে ঘুরিয়া আসিয়া গম্ভীরভাবে স্ত্রীকে কহিলেন—"ওগো শুনেছ? এদিকে যে সর্ব্বনাশ!"

বিন্ধ্যবাসিনী ত্রস্ত হইয়া কহিলেন—"কি—কি?"

"ছেলেটা ব'য়ে যাচ্ছে।"

বিন্ধ্যবাসিনী কহিলেন—"সে কি?"

"বাবাজী প্রেমে পড়েছেন।"

বিন্ধ্যবাসিনী এমন একটা উত্তর সম্ভবও ভাবেন নাই। কতক্ষণ শব্দ করিতে পারিলেন না। কান্তিবাবুও কথা না কহিয়া 'গুণগুণ' করিতে লাগিলেন। স্ত্রী আবার জিজ্ঞাসা করিলেন—"হয়েছে কি?"

"কি আবার হবে? স্কুল কামাই করে বাবাজীর আজকাল যাদব বাবুর বাড়ীতে শুধুই হারমোনিয়ম শোনা হচ্চে।"

গৃহিনী আবার কতক্ষণ নীরব থাকিয়া উত্তর করিলেন—"কিন্তু সে যে রোজ দশটার সময় ভাত খেয়ে বই হাতে করে স্কুলে বেরোয়?"

কান্তিবাবু কহিলেন—"বেরোয় তো, কিন্তু ঐ পর্য্যন্ত। বেরিয়ে স্কুলের পথে যায় না, যায় ঐ যাদববাবুদের বাড়ীর পথে।"

তারপর একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া কান্তিবাবু আবার বলিলেন—"দশটায় বেরোয় বল্লে কিন্তু কটায় ফিরে আসে দেখেচ?"

"আজকাল বড্ড দেরী হয়।"

"আগে এমন হ'ত না। এখন বাড়ীর প্রতি আকর্ষণ ক্রমেই কমে আসচে।"

বিন্ধ্যবাসিনী ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন—"কোথায় শুনে এলে এ সব কথা শুনি ?"

"এ-সব কথা রাষ্ট্র না হয়ে যায় না। পাড়ায় একটু কথা উঠেচে। ঐ হেমবাবুর ছেলেটাকে তো জানো। তার সঙ্গে যাদব বাবুর মেয়ের বিয়ের কথা হচ্ছিল না ? তা এই সব আন্দোলন হতে ভদ্রলোক নাকি এখন পিছিয়ে যাচ্ছেন, কিন্তু যাদব বাবুর ঐ ছেলেটা নাকি বল্‌ছে, কিরণই তার বোনকে বিয়ে করবে।"

শুনিয়া বিন্ধ্যবাসিনী আকাশ হইতে পড়িলেন। যাদব বাবুরা ঠিক ব্রাহ্ম ন'ন, কিন্তু ব্রাহ্ম না হইলেও চলা ফেরাটা সেই রকমেরই। কান্তিবাবুর সঙ্গে এমন স্থলে বৈবাহিক সম্বন্ধ অসম্ভব। কান্তিবাবু বাহিরের আচার ব্যবহারে যাহাই হউন, কিন্তু ধর্ম্ম বিশ্বাসে গোঁড়া ছিলেন। ছেলে যে এমন ভাবে সেখানে যাইয়া জড়াইয়া পড়িবে, ইহা তিনি স্বপ্নেও ভাবেন নাই, যদি সত্যসত্যই তেমন একটা কিছু অঘটন ঘটিয়া পড়ে, ভাবিয়া এখন তাঁহার চিন্তার অবধি রহিল না। বিন্ধ্যবাসিনী একবারে কাঁদিয়া ফেলিবার উপক্রম করিলেন। বলিলেন,—"কি সর্ব্বনেশে কথা গো ! এখন উপায় ?" কান্তিবাবু ও বিচলিত হইয়া পড়িয়াছিলেন, বলিলেন,—"নেশায় পেয়ে বসেচে, এখন যদি এর পাণ্টা কিছু দাওয়াই না পড়ে তবে কোথায় যে গিয়ে এর শেষ হবে, তা বল্‌তে পাচ্ছিনে। আমি ছেলের শিগ্‌গির বে দেব !"

বিন্ধ্যবাসিনী কহিলেন,—"একটা ভাল মেয়ে দেখ।" কান্তিবাবু তাচ্ছিল্য জানাইয়া কহিলেন,—"ভালমন্দ জানিনে, এই বৈশাখ

মাসের মধ্যেই কাজ সারচি, তাতে যা পাই এই যা মেলে। একটু আধটু বংশ বা চেহারার খুঁটী-নাটী নিয়ে আমি একমাত্র ছেলেকে গোল্লায় যেতে দিতে পার্ব্বনা। তুমি বলো ছেলেকে—"

বিন্ধ্যবাসিনী উত্তর করিলেন,—"আমি কি আর বল্‌বো?"

"বলবে—ওসব হার্ম্মোনিয়ম পিয়ানো শুনে ফল নেই। যেখানে আমি স্থির কর্ব্ব বিয়েটা নির্ব্বিচারে সেখানেই কর্ত্তে হবে।"

বিন্ধ্যবাসিনী ইহার আর জবাব দিলেন না। পরদিন হইতে সত্যসত্যই কর্ত্তা ইতস্ততঃ পাত্রীর খোঁজ খবর লইতে লাগিলেন।

কিন্তু কথা যত শীঘ্র শীঘ্র ফুরায়, কাজ তত "হুড়মুড়" করিয়া অগ্রসর হয় না। বিন্ধ্যবাসিনী ছেলেকে একদিন এই আসন্ন বিবাহের কথাটা বলিয়া মত জানিতে চাহিলে, ছেলে একবারেই জিজ্ঞাসা করিয়া বসিল,—"মেয়েটীর বয়স কত, চেহারা কেমন, লিখতে পড়তে গাইতে জানে তো?"

মা ঈষৎ বিরক্তি প্রদর্শন করিয়া কহিলেন,—"মেয়ে কি ঠিক হয়েচে যে তোকে এখনি এত সব খবর দেব? আর অত কথায় তোর দরকারই বা কি?"

কিরণ কহিল,—"বটে? আমাকে তবে বুঝি যা খুসী, একটা গছিয়ে দেবে মতলব করেছ! কিন্তু তা—হচ্ছে না। যাদববাবুর মেয়ের মত গাইতে বাজাতে না জান্‌লে আমি বিবাহ কচ্ছি না মা।"

মা প্রমাদ গণিলেন। কহিলেন—সে কি রে? আমাদের পরিবারে গান বাজনায় কি হবে? লক্ষীটী কর্ত্তার অবাধ্য হয়ো না।"

কিরণ কহিল—"যাও—যাও, এ বিষয়ে আমি কারো কথা শুন্‌বো না।"

বলিয়াই কিরণ চম্পট দিল। গৃহিণী অগত্যা কালীদুর্গাকে স্মরণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু এদিকে কান্তিবাবুরও বিপদের অবধি নাই। কন্যা খুঁজিয়া খুঁজিয়া হয়রাণ হইয়াছেন, কিন্তু কন্যাও কোথায় খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছে না। বলিয়াছেন বটে যা মেলে তাই একটা ধরিয়া বৈশাখ মাসের মধ্যেই কার্য্য নিষ্পন্ন করিবেন, কিন্তু কৈ, বৈশাখ গেল, জ্যৈষ্ঠ গেল, আষাঢ় প্রায় যায় যায় কিন্তু বালিকা মনোনীত হইল না। কিরণ নির্ব্বিবাদে যাদববাবুদের আলয়ে যাতায়াত করিতেই লাগিল। এত বড় পুত্রকে প্রকাশ্যে কোনও রূপ নিষেধ করিতেও পিতামাতা পারিলেন না অথচ এদিকে পাল্টা "দাওয়াই" টাও পাকাইয়া দিতে পারিতেছেন না, কান্তিবাবু মহাসমস্যায় পড়িলেন।

কিন্তু এমন সময় দেশ হইতে একদিন একখানা গুরুতর পত্র আসিয়া হাজির হইল।

পত্রখানি লিখিয়াছেন গ্রামের হরিশ ঘটক। বিবরণটা এইরূপ :—

"মহাশয় গো, শুনিলাম গিন্নি ছেলের বে দিচ্ছেন। তা দিন—দিন—কিন্তু আপনার ছেলে—এমন একটা যা তা সম্বন্ধ স্থির কল্লেন কেন? বলি মশাই, হরিশঘটক কি আর বেঁচে নাই? তাকে কি একবার জিজ্ঞাসা বাদও কর্ত্তে নেই? শেষকালে কি সামান্য ঘটক ভয়ে ভীত হলেন? শুন্‌লাম, ব্রজবাবুর মেয়ের সঙ্গে গোপনে গোপনে

কিরণের বে ঠিক করে ফেলেচেন? সাগরের মাছ শেষটা এসে কুপে পড়লো। যাক্—একটা ভাল সম্বন্ধ হাতে ছিল—বলেন তো এখনো আলাপ চালাতে পারি। আমাদের ধনঞ্জয়বাবুর মেয়েটী। যখন আপনি দেশে এসেছিলেন, তখন তো সে এই দশ এগারো বছরেরটী ছিল। কিন্তু এখন তেরোয় পা দিয়েছে। এখন মেয়েটী দেক্‌তেও যেমন ডাগর হয়ে উঠেচে, তার চেহারা ও বিদ্যা বুদ্ধিতেও তেমনি জোয়ার খেলেছে। অনেক দূরে রয়েছেন, তা নৈলে একবার দেখালেই পছন্দ হতো আর ধনঞ্জয়বাবু দেবেন থোবেনও কিঞ্চিং। যদিও তিনি পণপ্রথা নিবারণীর সভ্য, একবারে ফাঁকি দেবার মতলব নেই। ছেলের পড়ার খরচ বলুন, বিশ পঁচিশ ভরি সোণা বলুন, ঘড়ি শাল আসবাবপত্র বলুন—মিলিয়ে পণের টাকাটা পুষিয়ে দেবেন—আমায় তিনি স্পষ্টই জানিয়েছেন। চৌদ্দ পনের শ টাকা নগদ —যে করে হোক্ নেবেন। বংশটীও সদ্বংশ। বলেন তো ঠিক করি। ব্রজবাবুকে আপনি কি সত্য কোন কথা দিয়ে গেছেন। তারা তো পাড়াময় ঐ রাষ্ট্র করে বেড়াচ্ছে। আমাদের কিন্তু বিশ্বাস হয় না। কিন্তু যদি কথাটা মিথ্যে হয়, তবে দেখুন দেখি একবার ভদ্র-লোকের কাণ্ডটী। বলি শীঘ্র এর একটা বিহিত করুন, অত বাড়া-বাড়ি ভাল নয়”—ইত্যাদি ইত্যাদি।

পত্রপাঠ করিয়া কান্তিবাবু ও বিন্ধ্যবাসিনী উভয়েই অবাক হইয়া গেলেন। কান্তিবাবু কহিলেন—‘ব্রজকে তো আমি এমন কোন কথা বলিনি। তার মেয়েটার বে টা স্থগিত রাখতে বলেছিলাম, যদি ভাল পাত্র অন্যত্র না পাওয়া যায়, তবে কিরণ জামিন রউক—

এইমত একটু আভাস হতে দিয়েছিলাম, কিন্তু জামিন থাকলেই যে সম্পত্তির দান বিক্রয় হয়, তা জানতুম না। বলি তুমি কিছু বলেছিলে কি ?"

বিন্ধ্যবাসিনী বিস্ময়ের কণ্ঠে কহিলেন—"আমি ? না আমিতো কিছু বলিনি। ছেলে জামিনের কথাও আমি বলিনি, আর পুঁটির বে দিয়ে দেব—এমন কোন প্রতিজ্ঞাও করিনি, তবে চেষ্টা কর্ব্ব দেখ্‌বো এমন একটা আশ্বাস দিয়ে ছিলাম, কিন্তু এতে কি এমন কথা ওঠে!"

কান্তিবাবু এবার একটু হাসিয়া কহিলেন—"ওটা ব্রজর কাজ। সোজামানুষ—কিসে কি বুঝেছে, তাই রটিয়ে দিয়েচে। আমি এখন বুঝতে পাচ্ছি। যখন ওসব কথা হয়, আমার মনে হয়েছিল, সে আমার প্রস্তাবটা নিশ্চয় অগ্রাহ্য কর্ব্বে, একবার করেছিল তাও কিন্তু হঠাৎ আবার একটা কি কথা শুনে অকস্মাৎ তার মুখচোক আবার উৎফুল্ল হয়ে উঠলো। সে এক কথাতেই আমার কথাতে সায় দিলে, আনন্দ কর্ত্তে কর্ত্তে কৃতজ্ঞতার উপর কৃতজ্ঞতা জানিয়ে চলে গেলো। আমি একটু অবাক হয়ে রইলুম, ভেবে পাইনি এত সহজে সে রাজী হলো কি করে। কিন্তু এখন বুঝতে পাচ্ছি, আগা গোড়াই সে আমাকে ভুল বুঝেছিল।"

গৃহিণী কহিলেন, "হবে।"

কান্তিবাবু কহিলেন, "হবে নয়—ঠিক। সরল মানুষ, তার সরল চিত্তে সত্য বলে প্রথম যে ছায়াটী পড়েছে, সে মাথা ঘুরাঘুরি ছেড়ে দিয়ে তাকেই সত্য বলে ধরে নিয়ে, এই—বিভ্রাট ঘটিয়েছে।

কিন্তু আমি ভাবচি, এখন এর প্রতিকার কি? ছেলেকে জামিন রেখেছিলুম, কিন্তু সে তো এখন ছুটতে যাচ্ছে, বে করাতে যাচ্ছি, তাকে আর জামিন রাখা চলে না, আর জামিন না থাকলে দাবী-দাওয়াওটাই বা ও বেচারার উপর থাক্‌বে কি করে? এখন পুঁটীটার একটা গতি করে দেওয়াই উচিত। ভগবানের লীলা, কথা ভুলে যাচ্ছিলুম, হরিশের চিঠিখানাই কিন্তু স্মরণ করিয়ে দিলে। বাস্তবিক, ওই অনাথা মেয়েটার একটা, গতি করে দেব, মনে মনে সঙ্কল্প করেই তবে আমি ব্রজমিত্তিরকে অমন একটা অদ্ভুৎ অনুরোধ কর্ত্তে পেরে-ছিলাম। আর এ সঙ্কল্পটা কার্য্যে পরিণত কর্ত্তেও কষ্ট হবে না, ভরসা ছিল তাই নিজের ছেলেটাকেও জামিন দেখিয়ে ভরসা দিতে এতটুক দ্বিধা করিনি। ছেলের বে যে শেষটা এত শিগ্‌গির আবশ্যক হয়ে পড়বে, তা তখন ভাবতে পারিনি।"

বিন্ধ্যবাসিনী হাসিয়া কহিলেন—"দেখ, আমার এখন একটা কথা মনে পড়ছে। কিরণ একদিন আমায় বল্‌ছিলো—"কথা নেই বার্ত্তা নেই, পুঁটীটা হঠাৎ আমার সঙ্গে হাস্যালাপ বন্ধ কল্লে কেন?" তখন সেটাকে আমি যা বুঝেছিলাম, তা বলেই কিন্তু তাকে প্রবোধ দিয়েছিলাম, কিন্তু এখন মনে হচ্ছে, তা তো নয়। ভুল বুঝেছিলাম তখন, পুঁটী বোধ হয় এই কথাটাই শুনেছিল।"

কান্তিবাবুও একটু হাসিয়া উত্তর করিলেন—"হবে। এর আশ্চর্য্য কি? কিন্তু ছেলের এ বিষয়ে মত কি, তা কখনো বুঝেছ কি গিন্নি?"

বিন্ধ্যবাসিনী কহিলেন—"ছেলে যে এটা কখনো বেশী কিছু একটা ভেবে দেখেচে, তা আমার মনে হয় না। ছেলেবেলা থেকে

যেমন দুজনে একসঙ্গে ছেলেমানুষী কর্তো, এখনও বোধ হয় দুজনে ঠিক তেমনি মিশেছিল—এর বেশী কিছু ছেলের মনে হয়েচে, তা মনে হয় না।”

কান্তিবাবু কতক্ষণ নীরবে কি চিন্তা করিলেন, কিন্তু অবশেষে বলিয়া বসিলেন—“তবেই সমস্যা!”

সমস্যা! বিন্ধ্যবাসিনী বিস্মিত হইয়া কহিলেন, “সত্যি তুমি কি প্রীতির সঙ্গে কিরণের বিয়ের কথা ভাবচো!”

কান্তিবাবু হাসিয়া কহিলেন, “দুটো ভারই যে আমার উপর। রথ দেখা ও কলা বেচাটা একসঙ্গে যদি চুকে যায়—মন্দ কি?”

শুনিয়া বিন্ধ্যবাসিনা ঠাকুরাণী অনেক খানি অবাক্ হইয়া রহিলেন। এ প্রস্তাবটা তাঁহার নিকট অত্যন্ত নূতন। কোনও কালে কোনও সূত্রে মনের কোন কোণে ইহাকে স্থান দিয়াছেন বলিয়া স্মরণ হইল না। সহসা কিছু উত্তর দেওয়াও কঠিন হইল। কিন্তু যদিও কথাটা শুনিয়া কোনও উৎসাহও দেখাইতে পারিলেন না, তথাপি প্রস্তাবটাকে তিনি যে খুব ক্ষুণ্ণ হইলেন এমনটাও বোঝা গেল না। একটু পরে মন্তব্য প্রকাশ করিলেন, “যা অবস্থা দাঁড়িয়েছে, তাতে এমন একটা কিছু হলেই ভদ্রলোকের ইজ্জৎ রক্ষা হয় বটে। কিন্তু ভাবচি আমি—ছেলে এতে রাজী হবে কি? সেখানে কি এমনতর হারমোনিয়মের বাজনা আছে, না তেমনই নাচ গান গাওনা চল্‌বে।”

কান্তিবাবু অধীরভাবে উত্তর করিলেন, “সেও আমি দেখ্‌চি। সে জন্য ভেবো না গিন্নি। অপদার্থটাকে এ বিষয়ে এখন কিছুই বলা

হবে না। কিন্তু আমি অপর একটা কথা ভাবচি। এ নিয়ে ওদিকে না দেশে কোন বন্ধু বিচ্ছেদ ঘটে—জানতো?"

গিন্নী বুঝিলেন হরিশ ঘটকের কথা হইতেছে। এবার দেশে যাইয়া এই অযাচিত অনুগ্রহদানজীবী ব্রাহ্মণটার নিকট হইতে কান্তি বাবু যে অনেক সাহায্যই পাইয়াছেন এবং সে সব ক্ষুদ্র সাহায্যের বিনিময়ে ব্রাহ্মণ যে একটা কৃতজ্ঞতারও দাবী সৃষ্টি করিয়াছে তাহা তাঁহার আর অজ্ঞাত ছিল না।

বিন্ধ্যবাসিনী মৃদু হাসিয়া সম্মতিসূচক মাথা নাড়িয়া চুপ করিয়া রহিলেন। কিন্তু কান্তিবাবু হঠাৎ উঠিয়া দোয়াত কলম লইয়া চিঠি লিখিতে বসিলেন।

বিন্ধ্যবাসিনী জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি লিখতে বসলে?"

"হরিশের চিঠির জবাব দিচ্ছি।"

"কি জবাব দিচ্চ?"

কান্তিবাবু মৃদু হাসিয়া স্ত্রীর দিকে চাহিয়া কহিলেন, "তার প্রস্তাবটা অগ্রাহ্য করবার ক্ষমতা নাই, তাই লিখে দিচ্চি।"

বিন্ধ্যবাসিনী আশ্চর্য্য হইয়া কহিলেন, "ইস্?"

কান্তিবাবু আবার হাসিয়া জবাব দিলেন, "কেন, ইস্ কেন বল তো?"

গৃহিনী কহিলেন, "বল্লুম। তা আর হয় না।"

বিন্ধ্যবাসিনী স্বামীকে ভালরূপই জানিতেন, সুতরাং কথাটা বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। কিন্তু কান্তিবাবু জবাব দিলেন, "আচ্ছা শেষ করেনি, পড়ে দেখো।"

পত্র লেখা শেষ করিয়া কান্তিবাবু শেষটা স্ত্রীকে পড়িয়া দেখিতে দিলেন। বিন্ধ্যবাসিনী প্রথম এক পাতা পড়িয়া অবাক্ হইয়া গেলেন, কিন্তু চিঠিখানার শেষ পৃষ্ঠায় যাইয়া তাঁহার সংশয় ঘুচিল। স্বামী প্রথমটায় সত্যই হরিশ ঘটকের প্রস্তাবটায় সম্মতি ও আগ্রহ দেখাইয়া গিয়াছেন, কিন্তু শেষ দিকে যাইয়া উপসংহার করিয়াছেন, ব্রজর মেয়ের কথাটা ছেড়ে দাও ভায়া। ওরকম একটা প্রস্তাব উঠেছিল, কিন্তু টাকার দাবী উঠতে গুলিয়ে গেছে। তারা টাকা দেবে কোথা থেকে। এদিকে ২।৪ জন লোক টাকা নিয়ে দরাদরি কচ্ছেন। তিন হাজার পর্য্যন্ত উঠেছে। ধনঞ্জয় বাবু এতটা উঠতে পার্ব্বেন কি? তবেই ভায়া—তোমার কথা রাখতে আর কোন বেগ পেতে হয় না। নতুবা বোঝ তো গিন্নীকে বোঝান মুস্কিল।"

পত্রপাঠ শেষ করিয়া বিন্ধ্যবাসিনী রাগিয়া কহিলেন, "শেষটা সব দোষ আমার ঘাড়ের উপর চাপালে?"

কান্তিবাবু হাসিয়া কহিলেন, "ওগো ঘাবড়াচ্ছ কেন, ভারি তো দোষ। টাকাটা আদায় হলে না হয় তোমায় দুখানা ভারি গয়না তৈরী করে দেব, তবেই অপবাদটা সহ্য কর্ত্তে পার্ব্বে।"

গৃহিনী কহিলেন, "বরং যে গয়নাগুলি আছে, সেগুলি বেচেই তোমার পণের টাকাটা তুমি আদায় করে নিয়ে একটা ভাল মেয়ে ঘরে আনতে চেষ্টা কর, হরিশঘটককে ঘটকালীর টাকাটা চুকিয়ে দাও।"

কান্তিবাবু কহিলেন, "ঘটকালীর টাকা পেলে হরিশ আমায় মাপ কর্ত্তে পারে—তা সত্য বটে, কিন্তু দেবার সুবিধা পাচ্ছি না—"

"কেন বল তো?"

বরের বাপ

"কি বলে দেব? ব্রাহ্মণ আত্মীয় ভাব দেখিয়ে প্রস্তাবটা করে পাঠিয়েছে, শুধু তার ঘটকালীর প্রাপ্যের লোভ করেছে, তেমন ভাব দেখায়নি! ব্রাহ্মণের অবমাননা করা যায় না।"

বিন্ধ্যবাসিনী কহিলেন, "এ তুচ্ছ ভালমানুষিটা দেখাতে গিয়ে তুমি সব গোলমাল করে দেবে? এ যে ভাবতেও পারিনে।"

কান্তিবাবু হাসিয়া কহিলেন, "ব্যস্ত হয়ো না গিন্নি, তা হবেও না। তোমার বুদ্ধিটা আমার মাথায়ও এসেচে। হরিশকে ঐ ভাবেই হাত কর্ত্তে হবে, কিন্তু অত তাড়াতাড়ি নয়। তিনটা জিনিস বাঁচিয়ে তবে আমাকে কাজটা হাসিল কর্ত্তে হবে, বুঝলে কি কি?"

বিন্ধ্যবাসিনী কহিলেন, "না।"

"এক ওই হরিশ ঘটকের মান ও স্বার্থ; দুই, ধনঞ্জয় দত্তের সম্মান; তিন, নিজের স্বার্থ।"

"বুঝতে পাল্লুম না।"

"হরিশের কথাটা অবশ্য বুঝতে পেরেছ, ধনঞ্জয়ের কথাটা বলছি শোন। ধনঞ্জয় নিজেই নিশ্চয় তার মেয়ের সঙ্গে কিরণের বিবাহের কথা পেড়ে হরিশকে দিয়ে প্রস্তাবটা পাঠিয়েছে, হঠাৎ প্রত্যাখ্যান কল্লে সে অপমান বোধ কর্ব্বে, আমি তা কর্ত্তে চাই না। কিন্তু প্রকারান্তরে টাকার দাবী তুলে তাকে সরিয়ে দেওয়া সোজা। আমি সেই চেষ্টা কর্ব্ব, আর সঙ্গে সঙ্গে একটা গুরুতর বিষয়েও তার চোখ খুলে দেব।"

"সে কি?"

"ওই যেটা নিয়ে সে এই লাফালাফিটা কচ্ছে—পণপ্রথা নিবারণের আন্দোলনটা—"

"তুমি ছেলের উপর টাকা নিতে যাচ্ছ—তুমি আবার তার চোখ খুলবে কি?"

কান্তিবাবু হাসিতে লাগিলেন। গৃহিনী কহিলেন, "হাসচো যে?" কান্তিবাবু কহিলেন, "ওই তো। তা বুঝলে আর তুমি এত ঘাবড়াতে না। তারপর কেমন একটু অর্থপূর্ণ মৃদুহাস্য সহকারে কহিলেন, "আমি টাকাও নিতে যাচ্ছি না, আর—ধনঞ্জয় দত্তের কন্যাকেও পুত্রবধূ কর্ব্ব না—কটা দিন পরে দেখো গিন্নি!"

বিন্ধ্যবাসিনী তাঁহার স্বামীর এই সব হেঁয়ালিমত কথার কোন প্রকার মাথামুণ্ডু নির্দ্ধারণ করিতে না পারিয়া প্রশ্ন করিলেন, "তবে এ সব কি?"

কান্তিবাবু কহিলেন, "এ সব শুধুই একটা জোচ্চুরি। বলুন তো ছেলের বিয়ে ঠিক কর্ত্তে গেলে তিনটি জিনিস আমায় বাঁচিয়ে কাজ কর্ত্তে হবে। তাই এ সবের আবশ্যক হলো। বরের বাপের বজ্জাতি দেখ, তবু ওই লোকগুলির বিশ্বাস কন্যাদায়ের জন্য—যত কিছু দায়ী এই বরের বাপগুলির। ক'নের বাপেরা নিজেই যে নিজেদের বিভ্রাটের সৃষ্টি কচ্ছেন, তা একবারও তাঁরা ভেবে দেখেন না। কিন্তু এবার দলপতি মশাইকে আমি তা ভাল করেই একটু দেখিয়ে দেব—"

"কি কর্ব্বে?"

"এই যে পণপ্রথা—পণপ্রথা বলে চেঁচিয়ে মচ্ছেন, আর বরের

গুষ্টিকে তা নিয়ে তাড়াহুড়ো দিচ্ছেন, কিন্তু বাস্তবিক ওজন্য দায়ী কারা সেইটে দেখিয়ে দেব।"

"তুমি মনে কর, কনের বাপ ওজন্য দায়ী?"

"শুধু কনের বাপ আমি বল্‌ছি না কিন্তু শুধু বরের বাপও নয়। উভয়েই তুল্য দায়ী অথবা দুজনার কেউ এজন্য দায়ী নয়। ও নিয়ে কনের বাপকে বা বরের বাপকে কাকেও ঠেঙ্গালে চল্‌বে না, একটা প্রথাকেই আমাদের বদ্‌লে লওয়া উচিত—সেদিন বল্‌ছিলাম বটে—ব্রজকে এই কথাটা—"

গৃহিনী এত সব জটিল কথার ধার দিয়া না যাইয়া উত্তর করিলেন, "আচ্ছা, তোমরা টাকা চাও, তার জন্যেই না মেয়ের বাপেরা টাকা দেয়, এটা ঠিক কি না বল দেখি?"

কান্তিবাবু অম্লান বদনে বলিলেন, "বড় নয়—বেশী স্থলেই বরং কথাটা উল্টো। কনের বাপ টাকা না দিয়ে ছাড়বে না, বরের বাপকে বাধ্য হয়ে—"

বিন্ধ্যবাসিনী দৃঢ়ভাবে বলিয়া উঠিলেন, "মিথ্যে কথা।"

কান্তিবাবু আবার হাসিলেন। কহিলেন, "আচ্ছা, শুধু ধনঞ্জয় দত্তের নয়, সঙ্গে সঙ্গে এবার তোমার তাহলে অনেক খানি চোখটা খুলে দেব বলে দিলুম, সবুর কর একটু, চিঠির উত্তরটা আসুক।"

বিন্ধ্যবাসিনী হাসিয়া কহিলেন, "তথাস্তু।"

কান্তিবাবু কহিলেন, "শুধু তথাস্তু বল্লেই হবে না, হার্‌লে সত্যি সত্যি ঐ অলঙ্কারগুলি কিন্তু চাই—মনে থাকে যেন।"

বিন্ধ্যবাসিনী আবার হাসিয়া কহিলেন, "তথাস্তু বল্‌তে তো বারণ কল্লে, এবার কি বলি বল ?"

"এবার আর বল্‌তে বাধা নাই, এবার তো শুধু তথাস্তু নয়, এবার যে ডবল তথাস্তু হবে—"

"ওঃ ! আচ্ছা তবে এবার ডবল তথাস্তুই দিলুম। কেমন হলো ?"

কান্তিবাবু হাসিয়া কহিলেন, "হলো।"

বিন্ধ্যবাসিনী রান্নাঘরে রান্না চড়াইয়াছিলেন, এমন সময় হঠাৎ কান্তিবাবু সেখানে আবির্ভাব হইয়া বলিলেন—"ওগো শুন্‌চো! —দেখ—দেখ—"

ঝোলের কড়া হইতে নজর না তুলিয়াই গৃহিনী কহিলেন—"কি ?"

"ঘটক মশাইর উত্তরটা এসেচে, একবারটী দেখ।" সকৌতুহলে মুখ ফিরাইয়া বিন্ধ্যবাসিনী এবার চাহিয়া দেখিলেন, স্বামীর হাতে দু'খানা চিঠি—বলিলেন, "কি লিখেচে ?"

কান্তিবাবু হাসিয়া কহিলেন, "ধনঞ্জয় দত্ত, সাড়ে তিন হাজার দিতে রাজী।"

বিন্ধ্যবাসিনী তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইলেন, বলিলেন, "বল কি ?" কৈ দেখি ?"

কান্তিবাবু পত্র দেখাইলেন। বিন্ধ্যবাসিনী অপর চিঠিখানার প্রতি চাহিয়া—পুনঃ জিজ্ঞাসা করিলেন, "ওটা কি ?"

"ওটা জবাব।"

"তুমি লিখ্‌লে ?"

"হাঁ।"

"কি লিখ্‌লে শুনি ?"

"এবার চার হাজার হাঁক্‌লুম। লিখলুম, এখানে একজন ঐ টাকা দিতে চায়।"

"আবার!"

"আবার!"

"দেখই না মজাটা। পণপ্রথা নিবারণীর চাঁদা বের কচ্ছি—"

গৃহিনী হাসিলেন। একটু পরে কহিলেন,—"যা-ই বল, তোমরা চাও, দাবী কর, তাইতেই তো তারা টাকা দিতে আসে। যেচে দিতে আসে কি?"

কান্তিবাবু কহিলেন, "এ যেচে দেওয়া নয় ত কি? আমি কি ওঁর কাছে টাকা চাইতে গেচি। আমার ছেলের সঙ্গে বে না হলেই ধনঞ্জয় দত্তের মেয়ে যে অবিবাহিতা থাক্‌বে, তা আমি মনে করিনে। টাকা পয়সা না নিয়েও ওঁর মেয়ে বে করে এমন ঢের পাত্র আছে। ও সেখানে যায় না কেন? সে টাকা দিতে এখানে আসে কেন?"

"যেখানে সুখে স্বচ্ছন্দে থাক্‌বে বলে মনে করে, সেখানেই একটু খরচ পত্র করতে হলেও লোকে মেয়ে দিতে চায়—এটা তো স্বাভাবিক!" কান্তিবাবু প্রত্যুত্তর করিলেন, "তবে এটাও বোধহয় অস্বাভাবিক নয় যে, যিনি ছেলের বে তে পণ না নেবেন, তিনি বেছে বেছে যেখানে মনের মতন ভাল মেয়েটী পাবেন, সেখানেই পুত্রের সম্বন্ধ স্থির কর্ত্তে রাজী হবেন। মনের মতনটী পেতে—"

এইবার গৃহিনী কথাটা অনেকটা বুঝিতে পারিলেন। স্বামীর কথার প্রতিবাদ করিবার আর তেমন কিছু না পাইয়া—সায় দিয়াই কহিলেন, "অবশ্য এটা ঠিক, অনেক ভাল মেয়ের পণের জন্য বে

হচ্ছে না, এটা যেমন আজ কাল দেখা যায়, আবার পণপ্রথা রহিত হয়ে গেলে, অনেক কুৎসিৎ কদাকার মেয়েরও বে দেওয়া তখন মহা মুস্কিল হয়ে উঠ্‌বে—তাও বোঝা যাচ্ছে—”

কান্তিবাবু হাসিয়া কহিলেন, “বুঝ্‌তে পেরেছ এবার? তাই বল্‌ছিলাম গিন্নি, এটা শুধু বরের বাপ বা কনের বাপেরই দোষ নয়, এটা একটা প্রথার প্রধান দোষ। মেয়ের বে যদি অত শিগ্‌গির দেওয়া অত জরুরী হয়ে না পড়ে—তবেই আমাদের কনের বাপদের অত তাড়া হুড়া পড়ে যায় না, আর তাড়াহুড়া না পড়লেই টাকা দেবারও বোধহয় অত আবশ্যক হয় না।—অবশ্য বরের বাপদেরও একটু দোষ আছে, তা আমি অস্বীকার কচ্ছি না—”

“কি?”

“ভাল মেয়ে পেয়েও টাকার জন্যেই অনেক সময় ওরা অনেকে দায়গ্রস্ত কনের বাপকে পরিত্যাগ করে—অনেক নিকৃষ্ট মেয়ের পিতার হস্তেও আত্ম সমর্পন করেন, ওটা ভাল নয়।”

কান্তিবাবু আরও কি বক্তৃতা করিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু এমন সময় মাছের ঝোল কড়ার উপর প্রায় শুকাইয়া উঠিল, দেখিয়া বিন্ধ্যবাসিনী রন্ধনে পুনঃ মনোনিবেশ করিলেন। কান্তিবাবু চিঠি পোষ্ট করিবার জন্য বাহিরে চলিয়া গেলেন।

ইহার পরে আরও মাস দুই মধ্যে কান্তিবাবু ও হরিশঘটকে ধনঞ্জয়বাবুর মেয়ের বিবাহ লইয়া অনেক দর কষাকষি হইল, ফলে কন্যাপক্ষ নিরাশ হইয়া অবশেষে ক্ষান্ত দিল। কান্তিবাবু প্রত্যেক চিঠির জবাবে দু'একটা নূতন প্রস্তাবের উল্লেখ করিয়া তাহাকে উপলক্ষ্য

পূর্ব্বক নূতন নূতন দর হাঁকিতে লাগিলেন। ধনঞ্জয়বাবু ছ'হাজার পর্য্যন্ত উঠিয়া চুপ করিলেন। তখন একদিন কান্তিবাবু চিঠিতে হরিশঘটককে এলাহাবাদ হইতে ছেলের বিবাহের নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইলেন।

নিমন্ত্রণ চিঠিটাতে পাত্রীপক্ষ বা কোনও তারিখের উল্লেখ ছিল না। কন্যা ঠিক হইয়াছে, অগ্রহায়ণ মাসের মধ্যেই বিবাহ হইবে, হরিশ ঠাকুরের উপস্থিতি একান্ত বাঞ্ছনীয়, তিনি যেন অবিলম্বে এলাহাবাদ রওনা হইয়া আসেন, বিবাহ উপলক্ষে তাঁহার কিছু প্রাপ্তিরও সম্ভাবনা আছে, ইত্যাদি ইত্যাদি কথা লেখা ছিল। এই শেষ কথাটার আভাস পাইয়াই হরিশঘটক কর্ত্তব্য স্থির করিলেন। ২।১ দিনের মধ্যেই পাঁজি দেখিয়া সস্ত্রীক যাত্রার দিন স্থির করিলেন।

কিন্তু এ যাত্রায় তাঁহার এক অপূর্ব্ব সঙ্গী জুটিল। যাহার বিবাহটী পণ্ড করিয়া দিতে হরিশ ঘটক এত মাথা ঘামাইয়াছেন, সেই পুঁটী ছুঁড়িটাই শেষটা আসিয়া তাঁহার সঙ্গ লইল। হরিশ কতকটা অবাক হইয়া গেলেন।

---

(৯)

পুঁটী কিরণের বাল্যসখী—সেই সম্বন্ধটা উপলক্ষ্য করিয়া পুঁটীর নামেও একটা নিমন্ত্রণ চিঠি আসিয়াছিল, পুঁটীর উহাতে আনন্দের সীমা রহিল না।

তাহাকে লইয়া মাঝখানে এত সব যে কাণ্ড হইয়া গিয়াছে, তাহা সে জানিত না। কিরণ চলিয়া যাওয়ার পর দিন হইতেই তাহার সম্বন্ধে—সে বড় বিশেষ কিছু আর একটা খবর পায় নাই, ক্রমে ক্রমে কালের প্রভাবে বিচ্ছেদের তীব্রতাটাও অনেক মন্দীভূত হইয়া আসিতেছিল, এমন সময় বাল্য সখার এই স্মৃতির নিদর্শনটুকু পাইয়া সে আপনাকে ধন্য মনে করিল।

বাস্তবিক, কিরণ যে এই আসন্ন বিবাহের মুখে, মনের মত জীবন সঙ্গিনী লাভ করিবার পূর্ব্ব ক্ষণেও তাহার কথা স্মরণ রাখিয়াছে, গ্রাম শুদ্ধ এত লোকের মধ্যেও খুঁজিয়া খুঁজিয়া এ শুভ উৎসবে তাহাকেই আহ্বান করিয়া পাঠাইয়াছে—ইহা তাহার হিসাবে তাহার জীবনের এক অতি বৃহৎ, চিরস্মরণীয়, চিরগৌরবের কথা। বহুদিন পূর্ব্বে একদিন সে যখন তাহাকে ঠাট্টা করিয়া প্রশ্ন করিয়াছিল, বে হলে কি আর আমাদের স্মরণ কর্ব্বে কিরণদা? তখন কিরণ যাহাই উত্তর করিয়া থাকুক, সে যে এ সময় সত্যসত্যই তাহাকে এতটা স্মরণ রাখিবে, স্মরণ করিয়া সেই স্মৃতির মর্য্যাদা

রক্ষার্থে সমস্ত গ্রামের ছেলেমেয়েদের মধ্যে কেবল তাহাকেই নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইবে, তাহা সে এক মুহূর্ত্তও মনে স্থান দিতে পারে নাই। আজ সত্যসত্যই তাহার সে সৌভাগ্য উপস্থিত হইল দেখিয়া অনিলা স্ফূর্ত্তিতে অধীর হইয়া উঠিল। লালরঙের সেই একান্ত গর্ব্বের সামগ্রী এলাহাবাদের চিঠি খানা, সে সর্ব্বত্র দেখাইয়া বেড়াইতে লাগিল।

কিন্তু এই গর্ব্বটা তাহার আরও স্ফীত হইয়া উঠিল সেইদিন যে দিন এই চিঠির উপরেও আবার একটা মণিঅর্ডার তাহার নামে আসিয়া উপস্থিত হইল। নিমন্ত্রণ চিঠিটা পাইয়া—অনিলা সত্যসত্যই অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছিল বটে, কিন্তু বাস্তবিকই যে খরচপত্র করিয়া সেই সুদূর দেশে সে এই নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে যাইতে পারিবে, তাহা সে কখনও মনে স্থান দিতে পারে নাই। কিন্তু কয়দিন পরে সত্যসত্যই যখন অনিলাকে হরিশ ঘটকের সঙ্গে—পাঠাইবার জন্য উপদেশ দিয়া এবং সনির্ব্বন্ধ সহস্র অনুরোধ করিয়া বিন্ধ্যবাসিনী ঠাকুরাণী পথ খরচ বাবত ২০৲ কুড়ি টাকা তাহার মাতার ঠিকানায় পাঠাইয়াছিলেন, তখন সকলেই কিরণের পিতামাতার এই সস্নেহ আহ্বানটার মর্য্যাদা রক্ষা করা একান্তই কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করিলেন, এবং অনিলাও কিরণদার জীবন সঙ্গিনীটীকে সত্যসত্যই একবারটি দেখিয়া চক্ষু সার্থক করিতে পারিবে বলিয়া সুখস্বপ্ন দেখিতে লাগিল।

কিন্তু অনিলার মনের ভাব যাহাই হোক, কিরণের এই আকস্মিক বিবাহের খবরে ব্রজবাবু ও মাতঙ্গিনী ঠাকুরাণী কিন্তু

যথেষ্ট আঘাত পাইলেন। এক লীলাবতীর নিকট ভিন্ন স্বামী-স্ত্রী তাহাদের এ গুপ্ত ভরসার কথাটা অপরের কর্ণান্তর করেন নাই,—এমন কি অনিলাকেও একটু আভাসে জানান নাই, কিন্তু ভরসাটা তাদের মনের মধ্যেই ক্রমাগত বাস করিয়া ক্রমে ক্রমে এতকালে শিকড় ও ডালপালা মেলিয়াছিল, হঠাৎ একদিনের একটা খবর ঝঞ্ঝার মত নির্দ্দয় ভাবে সেগুলাকে টানিয়া উৎপাটিত করিয়া ফেলিয়া দিতে যাইয়া বড়ই কষ্ট দিল।

কিন্তু উপায় কি, কিছু ছিল না। মজ্জমান ব্যক্তির তৃণাবলম্বনের মত, বিন্ধ্যবাসিনী ঠাকুরাণীর পত্রের এককোণে যে পুঁটীর বিবাহের চেষ্টা হইতেছে বলিয়া একটা প্রবোধের কথা ছিল, স্বামী-স্ত্রী সেইটাই অবলম্বন করিয়া মনকে বুঝাইতে ছিলেন। তাঁহারা হরিশ ঘটকের সঙ্গে পুঁটীকে এলাহাবাদে পাঠাইবেন সঙ্কল্প করিলেন।

হরিশ ঘটক আপত্তি করিতে পারিল না। বিশেষ পথ খরচের টাকাটা হরিশের তহবিলেই জমা হইয়া গেল—হরিশ এটা ভালই মনে করিল। শুভদিনে শুভক্ষণে পুঁটীকে ও স্ত্রীকে লইয়া সে এলাহাবাদ অভিমুখে যাত্রা করিল।

এলাহাবাদ পৌঁছিয়া হরিশ ঘটক খবর পাইল, কিরণের অতি ভাল সম্বন্ধ হইয়াছে, তাহারই কোন বড়লোক বাঙ্গালী বন্ধু লক্ষ্ণৌয়ে থাকেন—তাহারই পরমাসুন্দরী মেয়ের সঙ্গে প্রস্তাব। ঢের পাওয়া যাইবে। কিন্তু তারিখ এখনও ঠিক নাই। এইবার তারিখ ঠিক করিতে হইবে।

হরিশ ঘটক জিজ্ঞাসা করিলেন—"বরপক্ষের বিদায়ের কথাবার্ত্তাটা কি রকম? মর্য্যাদা রেখে কাজ কর্ব্বে তো?"

কান্তিবাবু অন্তরে অন্তরে হাসিয়া বেশ গুরুগম্ভীর মুখেই কহিলেন, "সেইটেতেই গোল। ওঁরাও কুলীন বলে বিদায় আদায় কিছু হবে না।"

"ব্রাহ্মণ, পুরোহিত?"

"তা অবশ্য ছেড়ে পার্ব্বেন না, সেটাতেও হাত সংক্ষেপ—তা বুঝতে পাচ্ছি।"

হরিশ ভয়ানক নিরাশ হইলেন। কহিলেন—"ভায়া, এত দূরদেশে এলুম—এত কষ্ট করে, সেকি মালটা এই করে খুইয়ে যেতে—"

কান্তিবাবু ভরসা দিয়া কহিলেন—"তা আপনি সে জন্য ভাববেন না। উনি কিছু না করেন, আমি আছি, সে জন্য চিন্তা কি?"

কথঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইয়া—হাসিয়া কহিলেন—"দেখো ভায়া, এ বৃদ্ধ বয়সে যেন না পয়সা খরচ করে কেবল পথখরচ ও অমর্য্যাদাই লাভ হয়—"

কিরণ নিজের বাড়ীর সম্বন্ধে অনেক কথাই জানে না। তাহার একটা বিবাহের সম্বন্ধ হইয়াছে, পাত্রীও একটা একদিন তাহাকে দেখানো হইয়াছে, পাত্রী সুন্দরী ও বুদ্ধিমতীও বটে, কিন্তু তথাপি এসব সম্বন্ধে সে খুব কম খবর রাখে, সে প্রায় সারাদিন যাদববাবুর বাড়ীতেই কাটাইয়া আসে, নিজের ঘরের সম্বন্ধে বেশী কিছু একটা খবর লওয়া তাহার পোষায় না। কিন্তু একদিন হঠাৎ বাড়ীতে আসিয়া তাহার এতদিনের এত বড় একটা উদাসীন ভাব এক মুহূর্তে ছুটিয়া গেল। বাড়ীর ভিতরে ঢুকিয়া রান্নাঘরের দিকে রান্নার খবর লইতে যাইতেছিল, এমন সময়—হঠাৎ কিরণ দেখিল, রান্নাঘরের দরজার সম্মুখে দাঁড়াইয়া—পুঁটী!

অনিলা কিরণকে দেখিয়াই তাড়াতাড়ি আসিয়া হাসিয়া তাহাকে প্রণাম করিল, কিন্তু তাহার সেই উদ্ভিন্নযৌবনামূর্ত্তির দিকে চাহিয়া কিরণ কেমন স্তব্ধ—হতবুদ্ধি হইয়া রহিল। প্রণাম করিয়া উঠিয়া হাসিয়া কি প্রশ্ন করিতে যাইবে, এমন সময় তাহার দিকে চাহিয়া অনিলাও কেমন সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল। উভয়েই উভয়কে মুখোমুখী দেখিয়া বুঝিতে পারিল, এই কয়টা বিচ্ছেদের দিনে উভয়ের উপরই একটা মহাপরিবর্ত্তনের ঢেউ বহিয়া গিয়াছে। কিরণ দেখিল, অনিলা আর সে অনিলা নাই, বাল্যের সেই প্রিয়তমা সঙ্গিনী, এই কিছুকাল পূর্ব্বেও যে তাহার কাছে সেই

বাল্যসঙ্গিনীটাই ছিল—আজ এই সামান্য কয়টা দিনে সে যে তাহার সেই দাবীত্বমূলক সম্বন্ধের অবস্থা অতিক্রম করিয়া এমন অনেকখানি দূরে চলিয়া গিয়াছে, যেখানে ঠেলিয়া উঠিতে গেলে তাহার নিজের আগেকার সরল প্রাণখোলা ভাব যে প্রস্তুত হইয়া আসিবে না—তা নিশ্চয় করিয়া বলা দুরূহ। অনিলা দেখিল কিরণও আর সে কিরণ নাই, এই বিচ্ছেদের নাতিপ্রশস্ত কালটাতে তাহারও চোখে, মুখে, বেশভূষায় এমন একটা পরিবর্ত্তন আসিয়াছে যাহা শুধু রহস্যময় নহে—বোধ করি বা তাহাদের সেই পূর্ব্ব আত্মীয়তার নাগালের বাহিরে। কিরণ আগে তত বেশভূষাপ্রিয় ছিল না, কিন্তু এখন অনেকখানি বাবু হইয়াছে; তাহার চুল ছাটা, টেরিকাটায় আগে কোন পারিপাট্য সে দেখে নাই, কিন্তু এখন দেখিলে অনেকক্ষণই অবাক হইয়া তাহাদের দিকে চাহিয়া থাকিতে হয়। কিরণের আগে গোঁফ দাড়ি ছিল না, কিন্তু এখন উহাদেরও রেখা পাত হইয়াছে। এক মুহূর্ত্ত উভয়ের দিকে চাহিয়া উভয়েই নীরব বিস্ময়ে এই কয়টী ব্যাপার লক্ষ্য করিয়া লইল, তারপর বিস্ময়ের প্রথম ধাক্কাটা সামলাইয়া গেলে উভয়েই হাসিয়া বাক্যালাপ আরম্ভ করিল।

কিরণ কহিল—"কি রে তুই—"বলিয়াই প্রশ্নটা কি ভাবে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিবে ভাবিতে লাগিল কিন্তু অনিলা সকল গোলযোগ চুকাইয়া দিয়া তাহাকে সরলভাবে কথাবার্ত্তা বলিবার এমন সুযোগ যোগাইয়া দিল যে সেই মুহূর্ত্তে কিরণের দ্বিধা সঙ্কোচ কাটিয়া গেল।

অনিলা কহিল—"কিরণদা তোমার কেমন বৌ হবে দেখতে এলুম। এ সৌভাগ্যটা যে বরাতে ছিল—"

কিরণ বুঝিল। কহিল, "বেশ বেশ, ভালই করেচিস্। মোণ্ডা মেঠাই এনেচিস্ তো? বৌকে যৌতুক দিবি কি?"

অনিলা হাসিয়া কহিল—"একটা দণ্ডবৎ! আমরা গরীব মানুষ আর কি দেব কিরণদা—জানতো সকলি?"

কিরণ হাসিয়া কহিল, "তা হবে না। দণ্ডবৎটা দেওয়া নয় তো। সেটা যে নেওয়া। কোথায় মোণ্ডামেঠাই দেবে,' না—তার পরিবর্ত্তে খানিকটা পায়ের ধূলো—এই বুঝি মতলব করে এসেচিস্—আচ্ছা বুদ্ধিমান তো—"

উভয়েই হাসিতে লাগিল। তারপর আরও গুটিকতক এমন কথাবার্ত্তা হইল যে বিন্ধ্যবাসিনী ঠাকুরাণী রান্নাঘরে থাকিয়া সকলি শুনিতে পাইয়া, কি একটু ভাবিয়া চঞ্চল হইয়া উঠিলেন, এবং একটু পরে তিনি বাহির হইয়া কহিলেন, "আচ্ছা মেয়েটাকে সোজা পেয়ে তুই যে এত কথা শুনাতে লেগেছিস, ওর বিয়ের সময় তুই কি দিবি বল্‌তো?"

কিরণ হাসিয়া কহিল, "কাকে, ওকে না ওর বরকে?"

বিন্ধ্যবাসিনী কহিল, "পাওয়ার দাবী দুজনেই করতে পারে। আচ্ছা ওকে কিছু না দিতে চাস্, ওর বরকেই কি দিবি বল্ না।"

কিরণ কহিল, "আসুকই না শালা একবার, তার দাড়ির মধ্যে ঝিঁঝি পোকা ছেড়ে দেব।"

বিয়ের কথা শুনিয়া—বিন্ধ্যবাসিনীর সম্মুখে অনিলা বড়ই সঙ্কুচিতা হইয়া পড়িয়াছিল, কিন্তু কিরণের কথা শুনিয়া তবু সে হাসিয়া ফেলিল। বিন্ধ্যবাসিনীও হাসিতে হাসিতে কহিলেন, "আচ্ছা দেখা যাবে,

আমিও এবার ওর বিয়েটা দিয়ে তবে ওকে দেশে ফেরত পাঠাচ্ছি।' তখন দেখে নিস্।"

বিন্ধ্যবাসিনী ঠাকুরাণী সকৌতুক স্নেহ ও আনন্দের স্বরে কথাটা কহিলেন বটে, কিন্তু মুখখানাতে এমন একটু রহস্যের ছায়া পড়িল এবং কণ্ঠস্বরে কেমন যেন কি একটা অদ্ভুত রকমের আভাস বাজিল যে কিরণ বা অনিলা তাহার কতখানি রহস্য, কত খানি বাস্তব তাহা কেহই ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারিল না। সেদিন স্নানাহার শেষে বাহির হইবার সময় হইলেও কিরণ আর বাহিব হইল না। ব্যাপারটা বিন্ধ্যবাসিনী ও কান্তিবাবু উভয়েরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। উভয়ের দিকে চাহিয়া উভয়ে একটু মৃদু হাসিলেন। আর বড় বেশী স্পষ্টতা লাভ করিতে পারিল না। কিরণ একবারে যাদববাবুদের বাড়ীর বৈঠক ছাড়িয়া দিল—এমনটা ঘটিল না। তবে এতদিন একটানা জোয়ারের বেগ তরতর করিয়া বহিতেছিল, তাহা মন্দীভূত হইয়া এবার কিরণের গতিবিধিতে জোয়ার ভাঁটা উভয়ই লক্ষিত হইতে লাগিল। এমন কি ক্রমে জোয়ার কমিয়া ভাঁটার প্রকোপটাই যে অত্যন্ত বেশী বাড়িয়া উঠিয়াছে, এমনটাও দেখা যাইতে লাগিল।

এই ভাবে কিছুকাল কাটিলে একদিন বিন্ধ্যবাসিনী ঠাকুরাণী হরিশ ঘটককে ডাকিয়া দেয়ালের ওপাশ হইতে মৃদুস্বরে কহিলেন—"আপনার কাছে আমার যে একটা নিবেদন আছে।"

হরিশ বলিল—"কি ?"

"একটা ভাল ঘটকালী করে দিতে হবে, আমি তিনশ টাকার ঘটক বিদায় কর্ব্ব।"

হরিশ একবারে চমকিয়া উঠিল, বলিল—"কার জন্যে ?"

"এই অনাথা পুঁটী মেয়েটার জন্যে। আমি ওর মাকে কথা দিয়েছিলাম, একটা ভাল সম্বন্ধ করে দেব—"

হরিশ আরও আশ্চর্য্য হইলেন। কিন্তু একটু ভাবিয়া চিন্তিয়া কহিলেন, "তা দেশে না গেলে তো পাত্র খুঁজে পাব না, আচ্ছা আগে কিরণের বিয়েটা হয়ে যাক্—"

বিন্ধ্যবাসিনী বলিয়া উঠিলেন, "না—না, আমার ইচ্ছা এক সঙ্গেই দুটো কাজ সমাধা করে নি। দু'বার ক'রে বিয়ের খরচ চল্‌বে কোত্থেকে ?"

হরিশ কহিলেন, "তা সত্যি, কিন্তু দেশে থাক্‌তে যদি অনুমতি কর্ত্তেন তবে হতো, এখানে যে—"

"আপনার মত লোক একটু চেষ্টা কর্‌লেই মিলে যেতে পার্ব্বে।"

"কি দেবেন-থোবেন ?"

"আমি আর কি দেব থোব ! ঘটক বিদায় কর্ব্বো, বে'টা করিয়ে দেব, আর আর আনুসঙ্গিক যা লাগে দেব, ছেলেকে হাতে তুলে আর কিছু দিতে পার্ব্ব না।"

'সে কি ? তাতে কি আজকাল মেয়ের বে হয় ?"

"আপনি একটু চেষ্টা করে দেখুন—আপনাকে যথাযোগ্য বিদায় কর্ত্তে আমি ক্রটী কর্ব্ব না।"

হরিশ ভাবিতে লাগিল। কিন্তু হঠাৎ কোনও কুল কিনারা না পাইয়া "আচ্ছা, জানাবো" বলিয়া সে দিনের মত বিদায় লইয়া চলিয়া গেল। কিন্তু পরদিন হরিশ আসিয়া আবার দু'একটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিল।

"মেয়েটীর অলঙ্কারপত্র কি আছে ?"

"ওর নিজের আর কি আছে, একছড়া হার, দুগাছা বাঁধানো চুড়ি, একটা নোলক—এই।"

হরিশ মনে মনে হাসিল, কিন্তু তিনশ টাকার লোভ সহজে ছাড়িতে পারিল না। বলিল, "আচ্ছা, পাত্রটী কেমন হ'লে চল্‌বে ?"

বিন্ধ্যবাসিনী উত্তর করিলেন, "মেয়েটী অত্যন্ত ভাল, পাত্রটী তার উপযুক্ত চাই তো, খারাপ হ'লে চল্‌বে না। আমি ঐটে অন্ততঃ ভাল চাই।"

হরিশ হাল ছাড়িয়া দিল! "স্বয়ং প্রজাপতির সাধ্য নয়" মনে মনে অমনই কি একটা মন্তব্য প্রকাশ করিয়া আবার সেই 'আচ্ছা, জানাবো' বলিয়া বিদায় গ্রহণ করিল, কিন্তু বাস্তবিক আর যে কখনো এ সম্বন্ধে গৃহিনীকে তাহার কিছু জানাইতে আসিতে হইবে, এ ভরসাই আর কিছুমাত্র মনে রহিল না।

কিন্তু মানুষের ইচ্ছায় কাজ হয় না, কাজ হয় ভগবানের ইচ্ছায়। সেদিন একটা কি গোলমেলে কথার আলোচনা করিতে করিতেই চট্ করিয়া হরিশের মাথায় নূতন একটা কল্পনা খেলিয়া গেল। বটেই তো, এটা হলে হয় না ? পুটী তাহার কেউ নয়, কিরণই বা তাহার কে ? সবই তো টাকার সম্বন্ধ। আচ্ছা, এমনটা হলেই বা মন্দ কি ? দেখা যাক্।

ব্যাপারটা এইরূপ ভাবে ঘটিয়া গেল। কান্তিবাবু হঠাৎ একদিন তাহাকে ডাকিয়া গোপনে গোপনে বলিলেন, "ভায়া, মহা মুস্কিলেই যে পড়লুম, করি কি বল তো ?"

হরিশ কহিল, "কি দাদা ?"

"বিয়েটা দেখচি পণ্ড হয়ে গেল। আহা হা, এতগুলি টাকা।"

হরিশ আশ্চর্য্য হইয়া কহিলেন, "সে কি ?"

"ওরা ছেলের কথা শুনে, এখন পিছিয়ে যাচ্ছে। ছেলেটার প্রতিবিধির খবরটা শুনেচ তো ?"

"এতে বিয়ে ভেঙ্গে গেল—"

"তাই তো, দেখচি। এখন উপায় ?"

হরিশ একটু ভাবিয়া কহিল—"দেখুন, এক কাজ করুন। আমি বলি কি, ওই ধনঞ্জয় বাবুর—"

কান্তিবাবু বাধা দিয়া বলিয়া উঠিলেন, "ওহে তুমি বুঝচো না। আমি কি আর সাধ করে তোমার উপদেশটা তখন গ্রহণ কর্ত্তে পারিনি। শুধু টাকা নয়—টাকা নয়, আরো কথা আছে—"

"আর কি কথা ?"

"ছেলেটা, মেয়ে গাইতে বাজাতে না জানলে বিয়ে কর্ব্বে না—পণ করেছে—"

"বলেন কি ?"

"সেই তো প্রধান মুস্কিল। কিন্তু তা তো আর যেখানে সেখানে বলা পোষায় না। তাই ওই টাকার কথা পেড়ে তোমাদের প্রবোধ দিইছিলুম।"

হরিশ অবাক্ হইয়া আবার কথাটা ভাবিতে লাগিল। তারপর কহিল, "আচ্ছা, তার জন্য কি ? অত ভয় খাচ্ছেন কেন ? আমি আছি, দেখুন শিগ্গির আর একটা জুটিয়ে দেবই।"

সেই দিন রাত্রিতে এই বিষয়গুলিরই চিন্তা করিতে করিতে হরিশের মস্তিষ্কে একটা নূতন ফন্দী প্রবেশ করিল। প্রথমটা হরিশ ভাবিল, "না এবার এলাহাবাদ যাত্রাটা তাহার মোটেই শুভ হয় নাই।" তারপর এখানে আসিয়া যে আর একটা প্রকাণ্ড ঘটকালীর ভার সে পাইয়াছে, সে কথাটা মনে হইয়া তাহার যা হোক্ একটু সান্ত্বনা লাভ হইল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই আবার কার্য্যটার অসম্ভবত্ব ও দুরূহতার কথাটা পর্য্যালোচনা করিয়াও তাহার মন অন্ধকার হইয়া গেল। তারপর, কিরণের বিবাহে যে কিছু পাওনা গণ্ডার ভরসা ছিল, সেটাও যে এমন ভাবে পণ্ড হইয়া গেল, এই সম্ভবাতীত ব্যাপারটাই তাহার সমস্ত মন জুড়িয়া অধিকার বিস্তার করিয়া রহিল। কিন্তু ইহারই সঙ্গে সঙ্গে কিরণের বিবাহ এখন না হইলে, পুঁটী মেয়েটার একটা বিহিত করিবারও যে একটুখানি সময় পাওয়া যাইবে সেই ভরসাটাও মনে আসিতে লাগিল। তারপরই অকস্মাৎ কি একটা কথা মনে পড়াতে, হঠাৎ হরিশ সেই নিশীথ রাত্রিতেও উত্তেজনাবশে বিছানার উপরে উঠিয়া বসিল। "তাই তো, এ যে সব দিকেই সুবিধে। কান্তি ভায়া বলছিল না, টাকার মায়া তার তত নয়, যত এই বেয়াড়া ছেলেটাকে পথে আনবার আগ্রহ? —তবে আর কি? দুটো ঘটকালীই যে এক সঙ্গে চুকে যায়। এক বর ও ক'নে দু'পক্ষ হতেই দু'দুটো, বিদায়—ব্যাস্!"

হরিশ পরদিন ঘুম হইতে উঠিয়াই কান্তিবাবুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিল। একটু সুযোগ বুঝিয়া আস্তে আস্তে কহিল, "একটা পরামর্শ আছে।"

কান্তিবাবু কহিলেন, "এখুনি ?"

হরিশ কহিল, "শুভস্য শীঘ্রং, একটু ঘরটায় চলুন।" গৃহে প্রবেশ করিয়া উভয়ে উপবিষ্ট হইলে, হরিশ কহিল, "দেখুন, কিরণের বিয়ে আমি ঠিক্ করেছি, ঘটকবিদায়টা কি দিচ্ছেন বলুন।"

কান্তিবাবু মহা উৎসাহ প্রকাশ করিয়া কহিলেন, "বল কি হে! কোথায় ?"

"আগে রফা ক'রে নিন।"

"মেয়ে কেমন ?"

"বেশ!"

"গাইতে, বাজাতে নাচ্‌তে জানে ?"

হরিশ দমিয়া গেল। বলিল, "না দাদা, তা তো জানে না ?"

কান্তিবাবু হাসিয়া কহিলেন—"তবে ?"

হরিশ একটু ভাবিয়া তারপর নিতান্ত গুরু গম্ভীর মুখে জিজ্ঞাসা করিল, "দাদা, আপ্‌নিও ওটা পছন্দ করেন না কি ?"

কান্তিবাবু কহিলেন, "আমি পছন্দ করি, তা তো বল্‌ছিনি; কিন্তু ছেলে যে—"

হরিশ কহিল, "তাতে আট্‌কাবে না। আমি বাবাজীকে প্রবোধ দিয়ে দেবো। সে টেরও পাবে না। তারপর কাজটা হয়ে গেলে—"

কান্তিবাবু গম্ভীর ভাবে মাথা নাড়িয়া কহিলেন, "বড় শক্ত ব্যাপার, সাম্‌লে উঠ্‌তে পারবে কি ?"

"আপনি হাতে থাক্‌লেই পারি।"

"আমি তো হাতে রয়েইচি। নাচ ও গানওয়ালী বৌ কি

সাধকরে আমি পরিবারে ঢুকাতে চাই তোমার বিশ্বাস? আচ্ছা, মেয়েটার পিতা দেবে থোবে কি?"

"কিচ্ছু না।"

"সে কি? সে যে ভারী ঠকা হয়।"

"বিনিময়ে আপনিও তাকে ঠকাবেন।"

"তার মানে?"

"তার একটা ভাই আছে, তার কাছে তিনি পয়সায় পুঁটী ছুঁড়িটাকে গছিয়ে দেবেন। বর-ক'নে দু'পক্ষের কিন্তু ঘটক বিদেয় দুটোই আমার চাই।"

কান্তিবাবুর বুঝিবার কিছু বাকী ছিল না। তাঁহার চোখ-মুখ উদ্ভাসিত করিয়া এমন একটুখানি বিজেতার গর্ব্ব মিশ্রিত আনন্দের দীপ্তি ফাটিয়া পড়িতে চাহিতেছিল যে তাহা বৃদ্ধ হরিশ ঘটকের অভিজ্ঞ দৃষ্টির উপরে লুকাইয়া রাখা একরকম অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছিল। তবুও বিপুল আয়াসে আত্ম দমন করিয়া তিনি হাসিয়া কহিলেন, "ওহে, সেজন্য আট্কাবে না। ওর জন্য কেন ভাব্চো. কিন্তু গিন্নী রাজী হবে কি, তাই ভাব্চি।"

হরিশও এইবার বিজেতার অতুল গর্ব্বে কহিল, "দেখুন, এ ছাড়া আর দ্বিতীয় উপায় নেই। এতে দুকুলই রক্ষা পায়, ওই পুঁটি ছুঁড়িটার ভারও কাঁধ থেকে আপনার নেবে যায়, আর কিরণ বাবাজীও ওই রাক্ষসীর কবল হতে পরিত্রাণ পেয়ে ঘরের ছেলে ভালোয় ভালোয় ঘরে ফিরে আসতে পারে। ভেবে দেখুন।"

কান্তিবাবু ক্ষণকাল গম্ভীর মুখে কি যেন চিন্তা করিলেন, তারপর

হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন, "যদি সত্যি সত্যি তাই হয়, আমার আপত্তি নাই। আচ্ছা, এইবার নামটা বল।"

তখন হরিশ একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া—কান্তিবাবুর মুখের দিকে অর্থপূর্ণ হাসি ফুটাইয়া চাহিয়া—আস্তে আস্তে কহিল—

"আমি পুঁটীর কথাই বল্‌চি।"

কান্তিবাবু আর মনের ভাব চাপিয়া রাখিতে পারিলেন না, তাঁহার মুখ হঠাৎ স্ফূর্ত্তি উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। তবুও যথাসাধ্য মনের অবস্থাটা চাপিয়া রাখিয়া তিনি বলিলেন, "সে কি ভায়া?"

"যদি টাকা না চান, তবে এর চেয়ে আর সৎ সম্বন্ধ কি আছে। মেয়েটী ভাল আপনারাও তাকে মেয়ের মত স্নেহ করেন, কিরণ বাবাজীও অনাদর করে এমন মনে হয় না, দু'জনের ছেলেবেলাকার ভাবের কথা ভেবে দেখুন। আমার বিশ্বাস এ সম্বন্ধটা বেশ শুভই হবে। মেয়েটী নাচ্‌তে গাইতে বা বাজাতে না জান্‌লেও বাবাজী তাকে অবহেলা কর্ত্তে পার্ব্বে না এ কথা ধ্রুব জানবেন।"

কান্তিবাবু এক মুহূর্ত্ত চুপ করিয়া থাকিয়া কহিলেন—"তোমার কথা ঠিক। পুঁটীকে অবহেলা কল্লে বাইরে এমন লক্ষ্মীছাড়ার মত ঘুরে বেড়াতে পার্ত্তো সে—এ আমারও মনে হয় না। আচ্ছা, আমি টাকার দাবী ছাড়্‌তে রাজী হলুম, কিন্তু ব্যাপারটা অত্যন্ত গোপনে সম্পন্ন কর্ত্তে হবে। বিয়ের পর অবস্থা যাই হৌক, এখন হঠাৎ এ প্রস্তাবটা উত্থাপন কল্লে, বাবাজী অসম্মতিও প্রকাশ কর্ত্তে পারে। ওদিকের টানটা এখনও একেবারে গেছে বলে মনে হয় না।"

হরিশ সায় দিয়া কহিল, "নিশ্চয়। বাবাজীকে এখন জান্‌তে

দিয়ে কোনরূপে ব্যাপারটাকে পণ্ড করে দেওয়ার সুবিধে দেওয়া হবে না। আচ্ছা, এ বিষয়টা আর একটু ভেবে, একটু ভাল রকম পরামর্শ করেই কর্ম্মে অবতরণ করা যাবে। আপনিও একটু ভেবে দেখ্‌বেন, আর বৌ ঠাক্‌রুণকে বল্‌বেন—”

ইহার পরে, কান্তিবাবু হরিশ ঘটক ও কান্তিবাবুর বন্ধুবান্ধব কয়েকজনের মধ্যে কয়েকদিন ধরিয়া খুব যুক্তি পরামর্শাদি চলিতে লাগিল। তারপর একদিন সকলেই শুনিল, কিরণ ও পুঁটী উভয়েরই বিবাহ আগামী মাঘমাসের সতেরই তারিখে—ব্যয়সংক্ষেপের জন্য—একদিনে এক সঙ্গেই ধার্য্য হইয়াছে। লক্ষ্ণৌ হইতে কন্যাপক্ষ এলাহাবাদ আসিয়া একটা বাড়ী ভাড়া লইয়া সেই বাড়ীতেই কন্যাদান করিয়া যাইবেন, কান্তিবাবু নিজে অপর একটা বাড়ী ভাড়া করিয়া অনিলাকে সেইখানেই পাত্রস্থা করিবেন।

কিরণ তাহার ভাবী শ্বশুরের কিছু পরিচয় পূর্ব্বেই শুনিয়াছিল, সে উদাসীন ভাবেই খবরটা গ্রহণ করিল। অনিলা তাহার বরপক্ষের খবর বিশেষ কিছুই জানিতে পারে নাই, সে 'যা হোক্ একটা হবে কিছু' এই সাব্যস্ত করিয়া—দিন কাটাইতে লাগিল।

কিন্তু কিরণ ও অনিলার মধ্যে একদিন একটু এবিষয়টা লইয়া রহস্যালাপ হইতেও বাকী থাকিল না।

অনিলা চুপ করিয়া একলাটী একটী ঘরে বসিয়াছিল, দেখিয়া কিরণ স্ফূর্ত্তিভরে গিয়া কহিল—“কিরে ভাবচিস্ কি, কেমন বরটী হবে, সেই কথা।”

অনিলা রাগিয়া বলিল—“যাও। সে চিন্তায় তো আমার ঘুম

হচ্ছে না। সত্য কথা বলবো তবে শুনবে? আমি এ বরটার ভাবী গিন্নিটার কথাই ভাবচি। আচ্ছা তাকে তো তুমি একবার দেখেচ কিরণদা, কেমন বল না!"

কিরণ হাসিয়া কহিল—"দেকেচি একটা যেন পেঁচা!"

অনিলা হাসিয়া কহিল—"বেশ বেশ, ভালইতো তাহলে রাত জাগবার ভারী সুবিধে হবে। কিন্তু ঠাট্টা নয়, আমাকে ঠিক কথা বল বল্‌তেই হবে।"

কিরণ বলিল—"আমি তো একটা উত্তর দিলুম, তুই একটা জবাব আগে দিয়ে নে।" বোনাইটী কেমন আসচে, কি শুনলি বল্ তোর মনে ধরেছে তো?

অনিলা লজ্জিতা হইয়া কহিল—"যাও" কিন্তু একটু পরেই আবার অনুরোধ করিল "বল না, কিরণদা।"

কিরণ কহিল—"সে শালার দাড়ি আছে কি না, তা আগে না বললে আমি বলছি না। আমি একটা ঝিঁঝিঁ পোক কিনে রেখেছি তা জানিস?"

অনিলা হাসিয়া কহিল—"তাতে আমার কি? আমি কথাটা শুনতে চাচ্ছি, সেইটে শুধু বল, আমি আর কিছু শুনতে চাই না—বল না।"

কিরণ কহিল—"আমিও তোর ওই একশবার এক প্রশ্ন শুনতে ভাসবাসি না, আমি যা জানতে চাচ্ছি, সেইটে শুধু বল্‌তে বল্‌ছি।"

অনিলা দেখিল, কিরণ সহজে কথা ভাঙ্গিবে না, অনিলা হাঁফাইয়া উঠিল। বাস্তবিক তাহার নিজের অদৃষ্টটা জানিতে যত না উৎকণ্ঠা

হইতেছিল, এই কিরণদার ভাবী জীবন সঙ্গিনীটির কথা শুনিবার জন্য তাহার ব্যগ্রতা হইতেছিল ততোধিক। কেন এই অসম্ভব ব্যগ্রতা, কেন এই কৌতূহল। বাস্তবিক কারণটা অনিলা নিজেও খুব ভাল বুঝিতে পারিতেছিল না, কিন্তু তাহার দাদার ভবিষ্যৎ লিপিটা তাহার জীবনে যে তাহার ভবিষ্যতের চিত্র হইতেও অনেক মূল্যবান অনেক খবর লইবার সামগ্রী—তা তাহার মর্ম্মে মর্ম্মে, হৃদয়ের তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে কে যেন ধ্বনিত করিয়া দিতেছিল। ব্যর্থ মনস্কাম হইয়া অনিলা এইবার চুপ করিয়া রহিল। কিরণ একটুখানি সহানুভূতির স্বরে কহিল—"কি? রণে ভঙ্গ দিলি?"

অনিলা রাগিয়া কহিল—"দেব না তো কি? একটুখানি খবর চাইলুম, এখুনি তা দিলে না। পরে বিয়ে হলে, মনের মতনটী এসে'জাঁক করে উপরে চেপে বস্‌লে তখন যা মন খুলে কথা বল্‌বে, তা তো বুঝতেই পাচ্ছি।"

'মনের মতন' কথাটায় কিরণের সেই বহুকালের—পুরাতন একটা রহস্যালাপের কথা মনে পড়িল। কিরণ হাসিয়া কহিল—"তা তুই-ই বা বল্লি কৈ বোন, আমিও তো তোর কাছে যে দু'একটা কথা দাবী কর্‌তে না পারি তা নয়। তোরও তো এরই মধ্যে এই, এর পর না জানি—" বলিয়া কথাটা পালটাইয়া পুনরায় কহিল—"আচ্ছা ঠিক বল দেখি তোর কাছে এ দাবী কর্‌তে পারি কি না?"

অনিলা কহিল—"তাতো আমি অস্বীকার কচ্ছি না, কি বল্‌বো আমি কি কিছু জানি। আমার চেয়ে যে সকল বিষয়েই তোমার অনেক বেশী জান্‌বার কথা কিরণদা।"

কিরণ কহিল—"কিন্তু বিশ্বাস কর্ব্বি তুই, আমি কোন বিষয়েই কোন খবর যেচে নিতে যাই না, আমার নিজের বিষয়েও না। একবারে খাঁটি সত্য কথা।"

অনিলা কহিল—"এত বিরাগ কেন?"

"বিরাগও বুঝিনে, অনুরাগও বুঝিনে, ওই এদানী আমার স্বভাব দাঁড়িয়েছে।"

"আগে তো এমনটা ছিল না।"

"না, কিন্তু এখন হয়েচে কেন, অতশত বল্‌তে পার্ব্ব না।" বলিয়া কিরণ হঠাৎ আর কিছু না বলিয়া কেমন যেন পলাতকের মতই চলিয়া গেল। অনিলা অবাক্ হতবুদ্ধি হইয়া রহিল।

ইহার পর কয়েক দিন চলিয়া গেল। ক্রমে বিবাহের দিন নিকটবর্ত্তী হইয়া আসিতে লাগিল। বিবাহের দু'একদিন পূর্ব্বেও অনিলা কিরণকে দেখিতে পাইল, কিন্তু সে যেন কেমন বদলাইয়া গিয়াছে, কেমন যেন অত্যন্ত উদাসীন। তাহার মুখের উপর একটা গভীর বিরাগের ছায়া অনিলা যেন সুস্পষ্ট দেখিতে পাইল— দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া গেল। কিন্তু অনিলা ইহার কারণ খুঁজিয়া পাইল না। কিরণ এ বিবাহে সন্তুষ্ট নয় ইহা তাহার মনে অত্যন্ত সন্দেহ হইতে লাগিল। অনিলা নিতান্ত ব্যথিত হইয়া উঠিল। "যদি কিরণদার এতে মত নেই, তবে কেন তারা ওকে জোর করে এখানে বে দিচ্ছে, কিরণদা নিজেই বা কেন প্রতিবাদ করেন না।"

অনিলা একদিন বিন্ধ্যবাসিনীকে বলিয়া ফেলিল—"মা (এখানে আসিয়া অবধি অনিলা তাহাকে 'মা' বলিয়াই ডাকিত), কিরণদার

বোধ হয় এ বিয়েতে মন নাই, তাকে তোমরা ভাল করে জিজ্ঞাসা না করে কিছু কর না ?" কিন্তু অনিলার এ কথার উত্তরে বিন্ধ্যবাসিনী শুধু একটু হাসিয়াই নীরবে উড়াইয়া দিলেন, প্রত্যুত্তরে একটা কথাও তাঁহার মুখ দিয়া বাহির হইল না। অনিলা আরও আশ্চর্য্য হইল।

তারপর সত্য সত্যই একদিন সেই মাঘ মাসের সতেরই তারিখটা আসিয়া পড়িল। আগের দিন প্রভাতেই কান্তিবাবু কয়েকজন বন্ধু বান্ধবের ও বন্ধুপত্নীদের সঙ্গে দিয়া অনিলাকে একখানি নূতন ভাড়াটে বাড়ীতে পাঠাইয়া দিলেন। তার পরদিন সন্ধ্যাবেলা কিরণ শুভ যাত্রা করিয়া হরিশ ঘটকের সঙ্গে কন্যাকর্ত্তার বাড়ীতে বিবাহ করিতে চলিল।

বিবাহ সভায় বসিয়া কিরণ শুনিল, অকস্মাৎ অসুস্থ হইয়া পড়ায় কন্যার পিতা কন্যা সম্প্রদান করিতে পারিবেন না, কার্য্যটা ক'নের মামাকেই সম্পন্ন করিতে হইবে। কেমন করিয়া কথাটা কানে আসিয়া পড়িয়াছিল, তাই কিরণ শুনিতে পাইয়াছিল, নতুবা চারিপার্শ্বের কোন বিচিত্র ঘটনায় তাহার আদৌ মন ছিল না। সে এ ব্যাপারে নিতান্ত উদাসীনের মত হইয়া কি একটা অপর জগতের কথাই যেন নিতান্ত তন্ময় হইয়া চিন্তা করিতেছিল। তাহার সেই সম্পূর্ণ অমনোযোগী—অন্য ভাবনায় তন্ময় অবস্থায় বিবাহের মন্ত্র, সম্প্রদান, মায় শুভ-দৃষ্টি প্রভৃতি সকল শুভ কার্য্য এমন ভাবে নিষ্পন্ন হইয়া গেল যে সে তাহার একটাও টের পাইল না, এমন কি শুভদৃষ্টির সময়েও ঠিক কলের পুতুলের মত যখন ক'নের দিকে চাহিল তখন

তাহার নয়নেন্দ্রিয়ের সঙ্গে অন্তরেন্দ্রিয়ের কিছুমাত্র সম্পর্ক আছে বলিয়া কেহ বুঝিতে পারিল না।

এই সকল গুরুতর ব্যাপারের ভিতরে একবার মুহূর্ত্তের জন্য বুঝি বা কিরণের চমক ভাঙ্গিল। সে দেখিল যে একটা অত্যন্ত অবজ্ঞেয় লাল চেলির পুঁটুলিকে একখানা পিঁড়ির উপরে স্থাপনপূর্ব্বক সেই পুঁটুলিটাকে লইয়াই তাহার চারিদিকে নানা ব্যাপার চলিয়াছে। এক নিমেষের জন্য সে সেই অবগুণ্ঠনবতী চেলির পুঁটুলির পানে চাহিল। অমনি বিদ্যুতের মত একখানি আবাল্য পরিচিত প্রিয় মুখের সুমিষ্ট সুখদ স্মৃতি মনের ভিতর জাগিয়া একটা অসহ্য যাতনায় সহসা সমস্ত মনটুকু মোচড় দিয়া উঠিল। কিরণ ঝড়ের মত উদ্দাম একটা অত্যন্ত উত্তপ্ত দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে একটুখানি যন্ত্রণাদায়ক অস্ফুট শব্দ করিয়াই আবার বাহ্যজ্ঞান শূন্য হইয়া গেল।

তারপরে একবারে সেই, বাসরঘরে যাইয়া বয়স্যাদের হাসি পরিহাসে তাহার চৈতন্য ফিরিয়া আসিল। কিন্তু বয়স্যারা কেহই তাহার তেমন পরিচিতা ছিল না। দু'একবার মাত্র চাপা রসিকতা করিয়া তাহার একান্ত গুরুগম্ভীর চেহারা দেখিয়া সকলেই ক্রমে ক্রমে সরিয়া পড়িল। তখন পার্শ্বস্থিত পূর্ব্বদৃষ্ট সেই পুঁটুলি আকার নিথর পদার্থটার সম্মুখে কিরণ একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িয়া হঠাৎ পড়িয়া গেল।

শব্দটা বোধ হয় পুঁটুলির কানে গিয়াছিল। সে ঘুমায় নাই, সে শুইয়া শুইয়া এতক্ষণ তাহার কথাই ভাবিতেছিল, তাহার নিজের চিন্তার উপরও তাহার বাল্যসঙ্গিটীর ভবিষ্যৎ জীবনসঙ্গিনী

এতক্ষণে কিরূপে তাহার নিকটে জীবনের সর্ব্বস্বের ডালিটা সাজাইয়া অভিনন্দন করিতে অগ্রসর হইতেছে, তাই ভাবিয়া ভাবিয়া নিজের অস্তিত্ব, নিজের ভবিষ্যতের অস্তিত্ব, পার্শ্বস্থিত—জীবনের নব অভি-স্বামীটীর অস্তিত্বটী পর্য্যন্ত বুঝি ভুলিয়া যাইবার উপক্রম করিতেছিল, এমন সময়—এই দীর্ঘ নিঃশ্বাস ও সঙ্গে সঙ্গে পতনের শব্দটায় প্রাণের সহস্র কুণ্ঠা ঝাড়িয়া ফেলিয়া দিয়া সে মাথার উড়ানির ফাঁক দিয়া একটুখানি চাহিয়া দেখিল। আর সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুৎ চালিতবৎ হঠাৎ বিছানার উপরে তখনই সে উঠিয়া বসিয়া পড়িল।

কিরণ বালিসের দিকে মুখ ফিরাইয়া মাথা গুঁজিয়া পড়িয়াছিল হঠাৎ সে ডাকিয়া উঠিল—"কিরণদা!"

শব্দ শুনিয়া কিরণও ধড়মড় করিয়া ঝড়ের মত বিছানার উপর উঠিয়া বসিল, তাহার দিকে চাহিয়া বলিল—"এ কি?"

উভয়েই উভয়ের দিকে চাহিয়া অনেকক্ষণ বিস্ময় বিমূঢ় ভাবে চুপ করিয়া রহিল। কাহারই কণ্ঠ ভেদিয়া কথা বাহির হইতে চাহিল না, কিন্তু চোখ, মুখ, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ও বক্ষের স্পন্দন অনেক কথাই প্রকাশ করিয়া দিতে লাগিল। কিরণ শেষটা কহিল—"আমি সব বুঝেচি, কিন্তু এতটা গোপন কর্ব্বার কিছু কারণ ছিল না, আমি তোকেই চেয়েছিলুম, পুঁটী।"

অনিলার মুখে একটা সঙ্কোচ ও লজ্জার আভা, আজ বুঝি জীবনের সর্ব্বপ্রথম এক অতি অপূর্ব্ব—মধুর মূর্ত্তিতে দেখা দিল। অনেকক্ষণ নতমস্তকে চুপ করিয়া থাকিয়া সে কহিল, "এ মিথ্যা কথা কি—র—"

আর বলা হইল না। যে নামটা এত সহজে এই একটুখানি আগে পর্য্যন্তও সে নিঃসঙ্কোচে নির্ব্বিবাদে উচ্চারণ করিয়াছে, সেটা হঠাৎ কণ্ঠে বাধিয়া যাওয়াতে ক্ষোভ নয়, অতি অপূর্ব্ব আনন্দই তাহার আজ শিরায় শিরায় ধমনীতে ধমনীতে সুখের তাড়িত স্রোত বহাইয়া দিতে লাগিল, সে সুখের স্পর্শ কিরণকেও বিহ্বল করিয়া তুলিল। কিরণ এইবার জীবনের এই পুরাতন সঙ্গিনীকেই 'নূতন' রাজত্বে নূতন ভাবে অভিষেক করিবার জন্য তাহার কোমল বাহু যুগল সাদরে টানিয়া লইয়া নিজের গলায় পরাইয়া দিতে চাহিল।

কিন্তু অনিলা আপত্তি করিল। হাত টানিয়া লইয়া—সলজ্জ মৃদুহাস্যে ওষ্ঠদংশন করিয়া কহিল, "একটা পেঁচা, না? আচ্ছা, ঝিঁঝি পোকাটা কোথায় লুকিয়ে রাখ্‌লে, বল দেখি। আমার বড্ড ভয় কচ্ছে কিন্তু, মাগো, যে দাড়ি গোঁপের জঙ্গল, কাছে এগুবো কি করে?" বলিয়া হঠাৎ হাসিতে হাসিতে শুইয়া পড়িল। কিন্তু এমন সময়ে আরও একটা আ চর্য্য ব্যাপার কিরণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল।

কিরণ দেখিল, অনিলার সর্ব্বাঙ্গে অসংখ্য বহুমূল্য গহনা, আর সে সমস্ত গহনাগুলি প্রায় সকলই তার—মায়ের অলঙ্কার গুলির মত। কিরণ কহিল, 'এত গহনা কোথায় পেলে?"

অনিলা উঠিয়া, তাহার বাহু, প্রকোষ্ঠ, গলা, কান, সিঁথি, খোঁপা প্রভৃতি একে একে মুক্ত করিয়া—দেখাইয়া গর্ব্বের সহিত হাসিয়া কহিল, "আমার মা দিয়েচে।"

কিরণ কহিল "বুঝেচি। কিন্তু শুধু 'আমার মা' বল্‌লে কেন, 'আমাদেরই মা' ই নয় কি। সে যে—"

অনিলা উত্তর করিল, 'না, উনি শুধু আমারই মা। আর কারুর নয়। যে তার কথা শোনে না, শাসন মানে না, গর্ভধারিণী হলেও তিনি তার মা হতে যাবেন কেন? আমি সব জানি কি—র—"

কিরণ হাসিয়া কহিল, "কি বলতো?"

নাচ্‌তে গাইতে বাজাতে জানে না বলে, তুমি তাঁর কথার অবাধ্য হয়ে বে কর্ত্তে চাও নি—কোথাকার কে যাদববাবু না কার—"

কিরণ কহিল, "সে সব অনেকদিন বাতিল হয়ে গেচে, ওকথা আর কেন! তুমি এসে অবধি—সত্য বল্‌চি তোকে পুঁটী—"

অনিলা আপত্তি জানাইয়া কহিল, "আমি আর পুঁটী হতে চাইনে?"

কিরণ হাসিয়া কহিল, "তাই তো রে, তোর পোষাকী নামটা না কি? এখন যে সেটার বাস্তবিক দরকার।"

অনিলা কহিল, "বিয়েতে মন্ত্র পড়লে, এটাও শুননি?"

কিরণ কহিল—"কে জানে অতশত। তখন কি আর আমি 'আমাতে আমি' ছিলুম। আমি তখন তোর সেই বরশালার দাড়ি গোঁপের ভিতরে কি করে ঝিঁঝি পোকা পুরে প্রতিশোধ নেব—তাই যে শুধু—"

অনিলা হাসিয়া কহিল—"আচ্ছা এইবার তবে পুরো, আর তুমি না পারতো দাও আমার উপরই ভার—দেখি একবারটী—"

কিরণ কহিল—"তা দেখিস্ দেখিস্ ঢের সময় আছে, সারা-জীবনটাই যখন তোর একতারে এসে পড়েছে, অত ব্যস্ত কেন, কিন্তু নামটা বল্লিনি"

"শ্রীমতী অনিলা সুন্দরী—কেমন লাগ্‌চে ?"

"ঠিক্ ঠিক্; মনে হয়েচে বটে, এমনই কি একটা নাম, বার কতেক উচ্চারণ করেছি বটে কিন্তু কে জানে তখন, সেই একটা পুঁটুকে পুঁটীটেরই আবার এতবড় একটা লম্বাচৌড়া নাম— আচ্ছা হাঁরে; তখন কি তুইও একবার আমার নামটা শুন্‌তে পাস্‌নি! তুই ও যে বড় টের পাস্ নে।"

"ওগো, আমারও যে প্রায় তোমারি মত অবস্থা। আমিও যে ছাই, কেবলি সেই পেঁচামুখী আবাগের বেটীর কথাটাই ভেবে ভেবে মাথা গুলিয়ে বসেছিলুম! তারপর কার নাম কি জন্যে হচ্চে, তাই বা আমি বুঝবো কি করে বল।"

কিরণ কহিল, "তা ঠিক, কিন্তু আচ্ছা—সম্প্রদান কল্লে তোকে, ও লোকটা কে?"

অনিলা হাসিয়া কহিল, "চেন না, উনি যে আমার মামা, এ বাড়ীতে এসে ওঁকে দেখেচি, উনি থাকেন লক্ষ্ণৌয়ে, শুনলুম তোমার বাবা নাকি তাঁকে খবর দিয়ে এনেছেন—"

কিরণ হাসিয়া কহিল, "বাবাটা এইবার হলো শুধু আমারই বুঝি।"

অনিলা কহিল, "সে জন্য ক্ষোভ করো না, ও ভারটাও আমি নিতে অপ্রস্তুত নই; তবে কি জানো—দুটো জিনিসই একবারে তোমার নিকট হতে কেড়ে নেবো—আমি তত নেমকহারাম নই—"

উভয়েই হাসিতে লাগিল। কিরণের মনে বড়ই আশ্চর্য্য বোধ হইতে লাগিল যে শুধু অঙ্গ প্রত্যঙ্গে নয়, বুদ্ধি বিবেচনায়ও অনিলার প্রচুর পরিবর্ত্তন ও উন্নতি এত অল্পকালের ভিতরে এমনতর ভাবে

কেমন করিয়া সম্ভব হইতে পারিল যে তাহাকে শুধু পরাস্ত হইয়া মনে মনে মাথা নীচু করিতে বাধ্য করিল। বাস্তবিক আজ সে কথা-বার্ত্তায় তার চেয়েও ঢের বেশী অগ্রণী—কেমন 'চট্‌পট্' করিয়া সব কথার উত্তর দিয়া যাইতেছে। একটুখানি আগে পর্য্যন্ত যে এক দারুণ আশঙ্কা ও উৎকণ্ঠায় তাহার প্রাণ অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছিল, তাহা যেন হঠাৎ এখন কোথায় গা ঢাকা হইয়া পলায়ন করিল। কিরণ আবার একটু কাছে সরিয়া এইবার অনিলার গা ঘেঁসিয়া বসিল। অনিলা কহিল,—"ওকি ?"

"এতদিন দু'জনে যত সব বাজে খেলা খেলেছি, তা জন্মের শোধ বিসর্জ্জন দিয়ে, আজকার এই নূতন জীবনে নূতন বন্ধনের সঙ্গে সঙ্গে এইবার ভবের যেটা সব চেয়ে সাচ্চা সেই খেলাটায় তোকে নিয়ে নাবচি—"

বলিয়াই হঠাৎ অনিলার কণ্ঠ বেষ্টন করিয়া কিরণ তাহার উষ্ণ মুখ খানা একেবারে তাহার মুখের এত সম্মুখে লইয়া গেল যে, অনিলা সহসা কেমন এক রকম হইয়া ঘন ঘন শিহরিয়া উঠিল। অথচ জোর করিয়া কিরণকে ঠেলিয়া সরাইয়া দিতে কিছুতেই পারিল না এবং ইচ্ছাও হইল না।

এই একটি মুহূর্ত্তে কে জানে কোন এক চির অজ্ঞাত রহস্যময় নিয়মের বিধানে তাহার হৃদয় দুয়ারে হঠাৎ যেন কোন নন্দনের অতুল পারিজাত-সুরভি বিনা আমন্ত্রণে আসিয়া সারা হৃদয় মাতাইয়া বিভোর করিয়া দিল। এ কি বেদনা অথচ কি নিবিড় সুখের আবেগ তাহার সমস্ত অন্তর প্রভৃতি ওলটপালট করিয়া এই এক মুহূর্ত্তে কেমন

একটা অনির্ব্বচনীয় সৌন্দর্য্যময় নূতন জীবনের পত্তন করিয়া দিল। অনিলা অনেকটা নিঃসঙ্কোচেই এতক্ষণ কথাবার্ত্তা কহিতেছিল, কিন্তু হঠাৎ তাহার অন্তরের পরদায় এ কি মোহমদিরার রঙিন সমাবেশ? অনিলা আর তেমন মন খুলিয়া, কিরণকে 'কিরণদা' বলিয়া ডাকিয়া রঙ্গ রহস্য করিয়া তাহার সহিত কথাবার্ত্তা চালাইতে পারিল না। অন্তরের উপরকার পাতলা পর্দ্দাটা যেন উড়িয়া গেল—ভিতরের আসল পদার্থটা বাহির হইয়া পড়িল। অনিলা এইবার জড়সড় হইয়া মৃদুমন্দ কাঁপিতে লাগিল, কিরণেরও আর তেমন করিয়া মুখ ফুটিতে চাহিল না। তাহারও অন্তর-রাজ্যেও এ কি বিপ্লব, আজ এ কিসের সমাবেশ। স্বপ্ন কি ইহার চেয়েও মধুর? সেই নীরব নিথর রজনীতে অন্তর-রাজ্যের বহু কোলাহলময় অভূতপূর্ব্ব বিচিত্র আনন্দ উৎসবে উভয়েই উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছে। কিরণ হঠাৎ টানিয়া জোর করিয়াই অনিলাকে বক্ষে চাপিয়া ধরিল, সেই অন্তর ও ভৌতিক-রাজ্যের উভয় আকর্ষণে অনিলা আত্ম সমর্পণ করিয়া বুঝিবা জ্ঞান হারাইয়া চক্ষু মুদিয়া পড়িয়া রহিল।

তারপর অনিলা যখন আবার চক্ষু খুলিয়াছে, তখন বাহিরে সানাইয়ের বাজনায় সমস্ত পল্লীটা যেন মাতিয়া ভরিয়া গিয়াছে, বাসর ঘরের চারিদিকে হাস্য-কৌতুকক্রিয়া বয়স্যারা যে মৃদুমন্দ দরজায় আঘাত করিতেছে তাহা দূরাগত সঙ্গীত ধ্বনির মতই মধুর শোনা যাইতেছে, একটু দূরে হরিশ ঘটক ও অপরাপরের অস্পষ্ট আনন্দ ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হইতেছে।

বাসরঘরের প্রাতরনুষ্ঠানগুলি সম্পন্ন হইয়া গেলে কিরণের যত

বন্ধুবান্ধবেরা চারিদিকে আসিয়া তাহাকে ঘেরিয়া বসিল, কিরণ তাহাদের মতলব টের পাইল। এমন কি অদূরে গুপ্তভাবে তাহার কয়েকজন পিতৃবন্ধুও যে তাহাকে লক্ষ্য করিতেছে, কিরণ তাহাও বুঝিতে পারিল। বন্ধুবান্ধবেরা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাহার মুখপানে চাহিতেছে দেখিয়া, কিরণ একটা দুর্ভেদ্য পার্ব্বত্য-দুর্গের মতই মুখ খানাকে অসম্ভব রকম গম্ভীর করিয়া রাখিয়া প্রশ্ন করিল—"কি ?"

দু'একজন হাসিয়া কহিল, "বৌদি কেমন হলো জানতে এলুম।"

কিরণ রুক্ষভাবে কহিল, "দেখবার অবসর পাইনি, যে ঘুম পেয়েছিল—তাতেই নিরুপদ্রবে রজনী প্রভাত করে একেবারেই তোদের সঙ্গে শুভদৃষ্টি !"

তাহারা আশ্চর্য্য হইয়া কহিল, "বটে ?" তাহাদেরই একজন এ কথাটারই প্রতিধ্বনি করিয়া বলিল, "তাজ্জেই তো গা চটে—"

কিরণ কহিল, "চটলই বা তাতে আমার ক্ষতি নেই, লাভই আছে, আজ বুঝতে পাল্লুম। আচ্ছা বলতো রে তোরা—এ কাণ্ডটা যে এমন চালাকী করে ঘটিয়ে দিলে, এতে আসল ওস্তাদিটা কার ?"

এবার সকলে হাসিয়া উঠিল, সে হাসিতে কিরণও যোগ না দিয়া থাকিতে পারিল না। ব্যাপারটাতে কিরণের মনটা যে কি আকার ধারণ করিয়াছে, এইবার সে কথা বুঝিতেও কাহারও বাকী রহিল না। একজন কহিল,—

"ওস্তাদিটা আমাদের সব্বায়েরই। আমরা সকলেই যদি আগে হতে এমন সাবধানে, এমন মুখ বুজে না থাকতে পারতুম, তাহলে

কান্তিবাবু বা হরিশঘটক কারুরই এমন আলাদিনের প্রদীপ জ্বালবার শক্তি হতো না। কিন্তু এর মধ্যে আর একজন বিশেষ ওস্তাদ আছেন ভাই। বলতে গেলে তিনিই হচ্ছেন আসল মূল, নইলে আমাদের কারুরই কোন চেষ্টা বা শক্তি কাজে লাগতো না।"

কিরণ আশ্চর্য্য হইয়া কহিল, "কে ?"

ছেলেটা বলিল, "এখন নয়, ২।১ দিন পরে বল্‌বো।"

কিরণ কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া কহিল, "২।১ দিন পরে কেন, না, আজই বল্‌তে হবে।"

ছেলেটা এইবার কিছু গম্ভীর হইয়া বলিল, "আমরা সবাই কিছু কিছু জানি, কিন্তু তবু এত লোকের সাম্‌নে বলা চল্‌বে না।"

আর একটি ছেলে হঠাৎ মুখ বাড়াইয়া মুরুব্বিয়ানা করিয়া বলিয়া উঠিল, "আচ্ছা এত লোকের কাছে কি করে বল্‌তে হয়, আমি তা শেখাচ্চি। সঙ্কেতে বল্‌ছি, শোন—"

"আমরা এখানে কে কে উপস্থিত ?"

সকলে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, এ অদ্ভুৎ প্রশ্নটার উত্তর করিল না। ছেলেটা আবার কহিল, "আচ্ছা এটার জবাবে দরকার নাই, যার যার চক্ষুই জবাব দিচ্ছে, আচ্ছা আমাদের দলের লোক অনুপস্থিত কে কে ?"

এবার দু'চার জন বুঝিল। তাহাদেরই একজন বলিল— "বিপিন—"

তখন ঐ ছেলেটা বলিল, "তবে ঐ।"

কিরণ আশ্চর্য্য হইয়া কহিল, "সে কি ?"

ছেলেটী তখন ঘেঁসিয়া তাহার পাশে আসিয়া বসিল, কহিল "আমি সব জানি ভাই, শুধু তার ব্যবহারেই তুমি যে আর একটা 'যাকে তাকে' বিবাহ কর্ত্তে রাজী হয়েছিলে, তা নৈলে যে বিপিনের বোনকে ছেড়ে কাকেও বে কর্ত্তে রাজী হতে না, তা, আমার মত যার চোক আছে সেই বুঝতে পার্ব্বে। বাস্তবিক আমার মনে হয় এই আজকার বিয়েটার মূলে প্রধানতঃ—সেই। সে যদি না তোমার সঙ্গে এমন ব্যবহার কর্ত্ত, এমন ভাবে তোমায় না নিরাশ কর্ত্ত, তুমি সে প্রলোভনটা ছাড়্‌তে পার্ত্তে না, এ বিবাহও হতো না, এ মুক্তার হারও তোমার গলায় উঠ্‌তো না। সত্যি কি না তা তুমি নিজের বুকে হাত দিয়ে আমাদের সকলের সামনে সত্য বল দেখি ?"

. কিরণ হাসিয়া কহিল, "তুই ভারি সেয়ানা। বাস্তবিক এ 'যা-তা নয়, মুক্তার হারই বটে। তুই সত্যি জেনে রাখিস্।" তারপর কিরণ একটু চুপ করিয়া ভাবিয়া কহিল, "আচ্ছা, আমি এর প্রতিশোধ নেব, অখিল—তুমি দেখে নিও।"

সকলে বিস্মিত হইয়া কিরণের এই কথাটার তাৎপর্য্য বুঝিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু এমন সময় ,সেইখানে হরিশঘটক আসিয়া পড়িল।

সে দিন হরিশের স্ফূর্ত্তি দেখে কে, ইহার মধ্যেই সে একটা টাকার তোড়া আদায় করিয়া ফেলিয়াছে, হরিশ এখানে সেখানে মহা আনন্দ করিয়া বেড়াইতে লাগিল, এবং 'যাকে তাকে' কহিতে লাগিল, "এমন বৌ, সকলের ভাগ্যে হয় না। এমন ঘটকালীটা শুধু তাহার চেষ্টাতেই সফল হইল। তা নৈলে মুক্তার মালাটা

একটা যেখানে সেখানে যেয়ে—কি যে বলে সেই রকম একটার গলায় পড়েছিল আর কি ?"

কিরণ জিজ্ঞাসা করিল, "খুড়ো মশাই, ঘরে ফির্‌বো কখন।"

"এই যে সব ঠিক করে দিচ্ছি বাবা—" বলিয়া হরিশ আবার লাঠিমটার মত কোথায় একদিকে চলিয়া গেল। কিন্তু আর তাহাকে সে দিন গৃহযাত্রার পূর্ব্বক্ষণ পর্য্যন্ত কোথাও খুঁজিয়া পাওয়া গেল না।

জীবনের জন্য সঙ্গিনীকে জীবনের গ্রন্থিতে আচ্ছা করিয়া বাঁধিয়া কিরণ যখন ফিটনে করিয়া সে দিন গৃহে ফিরিবার জন্য রাজপথে বাহির হইয়া পড়িল, তখন তাহার মনে হইতে লাগিল, সে যেন বাস্তবিক একটা প্রকাণ্ড দিগ্বিজয় করিয়াই দেশে ফিরিতেছে। আজ সকালকার বিপিন সম্বন্ধীয় মন্তব্য শুনিয়া, কিরণের এখন কেবলই ইচ্ছা হইতে লাগিল, যদি গাড়ীটা একটু যাদববাবুর বাড়ীর সাম্‌নে দিয়া যাইত, যদি ঐ বাড়ীর জানালা কপাটের ভিতর দিয়া তার সুশিক্ষিতা সুগায়িকা বোনটী, এবং তাহার বাপ-মা এবং সে নিজেও, তাহার বাল্যসঙ্গিনীর এ রূপের ঝাঁকটা একবার দেখিত! বাস্তবিক, আজ বাম পার্শ্বে উপবিষ্ট সেই চিরকালের পুঁটীটার নানা আভরণে ভূষিত অঙ্গসৌষ্ঠবের দিকে আড়নয়নে চাহিয়া চাহিয়া আজ যেন তাহার আকাঙ্ক্ষা মিটিতেছিল না। সেই অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষাটার মধ্য দিয়া ক্ষণে ক্ষণে একটা গর্ব্ব, একটা তৃপ্তির বিকাশ, নৌকারোহীর চক্ষে নদীতীরস্থ কচিৎ দৃষ্ট দেবমন্দিরের মতই মনটাকে তাহার সংযত করিয়া রাখিয়া ছিল। কিরণ চারিদিকে হাসি ছড়াইতে ছড়াইতেই অগ্রসর হইতে লাগিল।

তাহার সেই হাসি দেখিয়া. তাহার পিতা, পিতৃবন্ধু ও অন্যান্য আত্মীয় স্বজনেরা সকলেই বুঝিলেন,—সংবাদ ভাল। কিন্তু তথাপি তাহার মা আসিয়া যখন বাড়ীর দরজা হইতেই বধূবরণ করিয়া ঘরে লইয়া গেলেন, এবং প্রাণ দিয়া উভয়কে আশীর্ব্বাদ করিয়া নানা ক্রীড়া কর্ম্মাদির অনুষ্ঠানে নির্জ্জনে একবার ছেলের নিকটে আসিয়া তাহার মন বুঝিতে চেষ্টা করিলেন, কিরণ তখন নষ্টামি করিতে ছাড়িল না।

মা জিজ্ঞাসা করিলেন, "বৌ কেমন হল রে? বেশ গাইতে বাজাতে—পড়্‌তে জানেতো?"

কিরণ রাগ প্রকাশ করিয়া কহিল, "তা জানুক না জানুক, লোকের সব বেশ কেড়ে কুড়ে নেবার বিদ্যাবুদ্ধি আছে,তার পরিচয় পেয়েছি।"

মা হাসিয়া বলিলেন, "কেন বল্‌তো?"

ছেলে কহিল, "ন্যাকামি করো না মা, তুমিই এটা সব চেয়ে আগে জানো, আবার তুমিই জিজ্ঞাসা কচ্ছ, কেন? আচ্ছা তোমার গয়নাগুলি কোথায় গেল?"

বিন্ধ্যবাসিনী হাসিয়া কহিলেন, "সেগুলি আমি একটা অনাথা, নিরাশ্রয়া দরিদ্রা বন্ধু কন্যাকে দিয়েছি—নতুবা তার বে হয় না—"

কিরণ কহিল, "বন্ধু কন্যাকে—না আপনার পুত্রবধূকে?"

বিন্ধ্যবাসিনী উত্তর করিলেন, "দূর, পুত্রবধূকে আমি ও সব দিতে যাবো কেন, আমার পুত্রবধূর জন্তে আমি আরো কত ভাল ভাল গয়না তৈরী করে রেখেছি, তা বুঝি দেখিস্‌নি?"

কিরণ আশ্চর্য্য হইয়া কহিল, "কৈ, না?"

বিন্ধ্যবাসিনী কহিলেন, "আচ্ছা, এ ঘরে আয়, কাল সেকরা দিয়ে গেছে খুলে দেখাচ্চি—বলিয়া ছেলেকে লইয়া গৃহিনী মহা উৎসাহে আপনার শয়নকক্ষে প্রবেশ করিয়া সিন্ধুক খুলিয়া একটা অতি সুন্দর মাঝারি রকমের ষ্টিলের বাক্স ছেলের সম্মুখে ফেলিয়া দিলেন। কিরণ চাবি লইয়া বাক্স খুলিয়া অবাক হইয়া গেল।"

বাক্সের ভিতরে হীরা জহরত, পান্না ও মুক্তা প্রভৃতি অসংখ্য বহুমূল্য জহরৎ 'ঝক্ ঝক্' করিতেছে। কিরণ কহিল, "এ সব কি কাণ্ড মা?"

বিন্ধ্যাবাসিনী কহিলেন—"আমার পুত্র বধুর এইতো উপযুক্ত অলঙ্কার, এর দাম সাত হাজার টাকা, কিরণ। "

কিরণ হতবুদ্ধি হইয়া অনেক্ষণ অলঙ্কার গুলির দিকে চাহিয়া থাকিয়া তারপর মার দিকে চাহিয়া একটু হাসিয়া কহিল'—

"সাধে কি আর পরের মেয়ে এমন কথা বল্‌তে সাহস পায়?" মা আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"

"কি কথা রে?"

"ও বলে কি জানো? বলে তুমি 'ওর মা' আমার মা নও, আমি তোমার কথা না শুনে যাদব বাবুর মেয়েকে বে কর্ত্তে চাচ্ছিলুম কি না, তাই আমি তোমার পর হয়ে গেচি।"

বিন্ধ্যবাসিনী হাসিলেন, কিন্তু হঠাৎ কি যেন একটা কোমল মধুর স্পর্শে তাহার অন্তরের মধ্যে একটা অত্যন্ত করুণ ভাব আসিয়া পড়ছিল, তাঁহার চোক ফাটিয়া দু'ফোটা জল বাহির হইবার উপক্রম করিল। বিন্ধ্যবাসিনী একটু পরে ছেলের দিকে চাহিয়া কহিলেন,

"ত্যাখ, এই এত সব অলঙ্কার দেক্‌চিস্‌, কিন্তু সব চেয়ে ওর বড় অলঙ্কার কোনটা জানিস্‌। ওর ওই চমৎকার অন্তরটি। এর কোন অলঙ্কার ওর পাশে দাঁড়াতে পারে না, এদের সব গুলির আলোতেও ওর চরিত্রের ছটাকে মলিন কর্ত্তে পার্ব্বে না। এ তুই জানিস্‌। আমি বুঝে শুনেই এ রত্ন এত কষ্টে তোর গলায় পরিয়ে দিয়েচি। খবর্দ্দার এর অবমাননা করিস্‌ নে। কোন গাইতে-বাজাতে-পড়তে-জানা মেয়ে ওর মত হতে পার্ব্বে না।"

কিরণ এ কথার আর কোন পাল্টা জবাব দিল না, কিন্তু সে যে মায়ের এই বিশ্বাসটা নিজের হৃদয়েও অভিনন্দন করিয়া লইয়াছে তাহা তাহার মুখ দেখিয়াই স্পষ্ট বোঝা গেল। তারপরে মায়ের মনের বাকী আস্থাটুকু! কিরণ আজ হঠাৎ মায়ের চরণে 'ঝুপ্‌' করিয়া একটা প্রণাম করিয়া, চলিয়া গেল। বিন্ধ্যবাসিনী এইবার বধূর নিকটে গেলেন।

অনিলা তাঁহার সঙ্গেতো সর্ব্বদাই কথা কহিত, কিন্তু আজ হঠাৎ এই এত সব ব্যাপারের পরে, তাঁহার চক্ষের দিকে চাহিয়া কোন কথা বলিতে বা কোন কথার উত্তর দিতে কেমন তাহার ভারী লজ্জা করিতে লাগিল।

বিন্ধ্যবাসিনী সকলই বুঝিলেন। তিনি নিকটে যাইয়া তাহাকে কোলে টানিয়া লইয়া সেই পুরাতন অলঙ্কারগুলি খুলিয়া ওই নূতন অলঙ্কারগুলি পরাইয়া দিতে লাগিলেন।

দুদিন পূর্ব্বে গৃহিনী যখন এই পুরাতন অলঙ্কারগুলি তাহার গায়ে তুলিয়া দিতেছিলেন, তখন সে কার্য্যটার যে প্রকৃত তাৎপর্য্য

কি, তাহা অনিলা খুব ভাল বুঝিতে পারে নাই। হয়ত তাহার কোনও গহনা নাই বলিয়াই, বিবাহ উপলক্ষে তাহার জ্যেঠাই মা কয়েক দিনের জন্য ঐগুলি দিয়া তাহাকে সাজাইয়া দিতেছেন—আবার কয়েকদিন পরে ফেরত লইয়া যাইবেন, অথবা হয়ত, অলঙ্কারপত্রের অভাবে তাহার বিবাহ হইতেছে না, এই কথা ভাবিয়া এইগুলি তিনি তাহাকে দান করিলেন—এইরূপ নানা কথাই তাহার মনে আসিয়াছিল, কিন্তু আজ এই নূতন গয়নাগুলি দেখিয়া, এবং এত সব ব্যপার জানিয়া এই গহনা রহস্যের প্রকৃত অর্থ বুঝিতে তাহার আর বিন্দুমাত্রও বিলম্ব হইল না। সে নতমস্তকে ঈষৎ লজ্জিতভাবে কহিল—"মা, তোমার আশীর্ব্বাদ হতে, ওসব গয়নাগুলিরই কি বেশী মূল্য? তবে কেন এত সব ভারী ভারী জিনিষ আমার গায়ে চাপাচ্ছ?"

মা কহিলেন—"এ ভার দেখেই চমকে যেয়ো না। এর চেয়ে আরো অনেক ভারী জিনিষ আজ তোমার ঘাড়ে তুলে দেব, সেইটার ভাল করে খবর রেখো। আমার ছেলেটা নিতান্ত সোজা নয় মা। তাকে তোমায় মানুষ কর্ত্তে হবে।"

অনিলা লজ্জায় এ কথার উত্তর করিতে পারিল না। বিন্ধ্যবাসিনী তখন একে একে সবগুলি গয়না অনিলার গায় পরাইয়া সকলকে 'বৌ' দেখাইতে লইয়া গেলেন। দরিদ্রের সুকুমারী কন্যা বেশ-ভূষার ঐশ্বর্য্যে স্বর্গের দেবীপ্রতিমার অপেক্ষাও উজ্জ্বল দেখাইতে লাগিল।

সেই দিনটা বরকনের সাক্ষাতে সুবিধা নাই—কিরণের মনটা কুয়াশাচ্ছন্ন হইয়া রহিল। বৈকাল বেলা কিরণ কি করিবে, ভাবিয়া

চিন্তিয়া যাদব বাবুদের বাড়ীর দিকে চলিয়া গেল। সে দিনও সে বাড়ীটাতে তেমনি গানবাজনার আড়ম্বর। কিরণ চুপি চুপি ভিতরে প্রবিষ্ট হইয়া জানালার ফাঁক দিয়া উঁকি মারিয়া চহিয়া দেখিল। হঠাৎ তাহাকে দেখিয়া ঘরশুদ্ধ সকলগুলি লোকই কেমন, শুদ্ধ বিব্রত হইয়া উঠিল।

ঘরে বিপিন, বীণা (যাদববাবুর মেয়ে) ও তাহারই অপর একটী বন্ধু প্রকাশ আরও কয়েকটি ছোট ছোট ছেলে মেয়ের সঙ্গে বসিয়াছিল বীণা অর্গেনটা বাজাইয়া গাহিতেছিল, তাহাকে দেখিয়াই সে উহা ছাড়িয়া সরিয়া আসিয়া বসিল। বিপিন যেন কিছুটা হতবুদ্ধি হইয়া গেল। প্রকাশের মুখে ভয়ানক বিষাদের ছায়া পড়িল।

ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া এক মুহূর্ত্তে কিরণ এ সব দেখিয়া লইল, হাসিয়া কহিল—"বন্ধ কর্‌লে যে! আমি শুধু তোমাদের বৌ ভাতের নেমন্তন্নটা কর্ত্তে এলুম। তোমাদের আমোদ মাটী কর্ত্তে চাই না।"

বিপিন "না—না—সেকি—মাটী হবে কি—"ইত্যাদি ভাঙ্গা ভাঙ্গা কথায় আমতা আমতা করিয়া কিরণের কথায় জবাব দিল, প্রকাশ "বসুন কিরণবাবু" বলিয়া তাহাকে অভ্যর্থনা করিল, কিন্তু বীণা তেমনি চুপটী করিয়াই রহিল।

এই প্রকাশ সম্বন্ধে সকল কথা কিরণ জানিত।

দুটো পরীক্ষায় বেশী পাশ দেওয়ার জোরে আজকাল এই সভ্য-পরিবারটীতে কিছুকাল যাবৎ তাহার আদর যে কিরণের আদরটাকে ছাড়াইয়া উঠিয়াছিল, এবং ক্রমে ক্রমে এই গানবাজনা পারদর্শিনী

বালিকাটী লাভ করিয়া সৌভাগ্যের সম্ভাবনাটাও যে তাহার কিরণের অপেক্ষা বেশী হইয়া পড়িতেছিল, কিরণ সেটা খুব জানিত এবং এই খুব জানাটা সেই বাসর রজনী প্রভাতে তাহারই আর একটা বন্ধুর কথাতে আরও পাকা হইয়া গিয়াছিল, তাই এখন সে বলিবামাত্রই তাহার অভ্যর্থনায় কর্ণপাত করিবায় ইচ্ছা প্রকাশ না করিয়া দাঁড়াইয়া জবাব দিল, "না প্রকাশবাবু, আজ তত অবসর হবে না, কিন্তু অনুগ্রহ করে যাবেন আপনি, ওদের অবশ্য তত আর বল্‌তে হবে না, কিন্তু আপনি একটা কুটুম, আপনাকে বল্‌তে হচ্ছে, অনুগ্রহ করে গরীবের এই নেমন্তন্ন গ্রহণ কর্ব্বেন। নতুবা আর দু'দিন পরে বীণার বাড়ীতেও আমাকে আশা কর্ব্বেন না।"

কথাটা যে 'আশা' নয়, বরং 'আশঙ্কা' এটা কিরণ, কিম্বা প্রকাশ অথবা সেখানকার সকলেই জানিত, কিন্তু তথাপি ভদ্রতার খাতিরে প্রকাশবাবু স্বীকৃত হইলেন। তখন কিরণ বীণাকেও "যাস্ কিন্তু রে" বলিয়া চলিয়া যাইতে উদ্যত হইল। কিন্তু বিপিন ধরিয়া ফিরাইল।

বিপিন কহিল—"বসো ভাই, চা তৈয়ারী হবে, না খেয়ে যেতে পার্ব্বে না।"

কিরণ কহিল, "আমার যে অত্যন্ত কাজ, ২।১ দিনের মধ্যে আবার শ্বশুর বাড়ী যেতে হবে, সেও এক হাঙ্গাম। জিনিসপত্রগুলি গুছাতে আছে—আজ থাক্ ভাই—"

কিন্তু কিরণের বিবাহের কথাগুলি শুনিবার জন্য বিপিনের অত্যন্ত আগ্রহ হইতেছিল, সে তাহাকে কিছুতেই ছাড়িয়া দিল না।

তখন অগত্যা সকলের সঙ্গে তাহাকেও চায়ের টেবিলে যাইয়া বসিতে হইল। প্রকাশ কিন্তু সেইখানে বসিয়াই অর্গেনটা ধরিয়া 'গুন্‌গুন' করিতে লাগিল।

সেই দিন সারাটা চা খাইবার সময়টাতে বীণা একটা কথাও বলিতে পারিল না। সে টেবিলের দিকে ও আশে পাশে বাজে জিনিষপত্রগুলির মধ্যে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া কেবলই চারি পর্শ্বের কথাবার্ত্তা শুনিয়া সময় কর্ত্তন করিতে লাগিল, দেখিয়া কিরণের মেজাজটা কিছু যেন তৃপ্তি লাভ করিল।

কিন্তু আজ ভাল করিয়া এই মেয়েটার দিকে চাহিয়া কিরণের অনেক মনের ভুলই কাটিয়া গেল। বীণা যে কেন তাহার এত প্রিয় হইয়াছিল, সে রহস্যটা কিরণ যেন আজ নখদর্পণে দেখিতে পাইল। অনিলাকে দেশে ফেলিয়া আসিয়া কিরণের অন্তরটা তাহারই একটুখানি ছায়ার স্পর্শ পাইবার জন্যই আকুল হইয়া উঠিয়াছিল এবং বীণা মেয়েটার ২।১টা লক্ষণে উহাকেই যে সে সেই ছায়াটা বলিয়া ভ্রম করিয়া দুধের আশা ঘোলে মিটাইতে ক্ষেপিয়া গিয়াছিল, এই সত্যটা আজ যেন সে দিব্যচক্ষে দেখিতে পাইল। এই কয়দিন অনিলাকে দেখিয়া দেখিয়া এবং গত এই দুদিন তাঁহার আলো অনেক গুহ্য রহস্য অবগত হইয়া আর এই বীণাকে তাহার কিছুমাত্র বিচিত্র বা অলৌকিক মনে হইল না বরং এই পরিবারের এই কর্ত্তব্য নির্ণয় বুদ্ধির শিথিলতায় তাহার আজ হৃদয় ভরিয়া কেমন এক অব্যক্ত বিরক্তির ও ঘৃণার ভাব জাগিয়া উঠিতে লাগিল, আজ এই অস্থিরচিত্ত পরিবারটার নিকটে বেশ প্রাণ ভরিয়াই সে তাহার এই বিবাহের ষোল আনা গুণ কীর্ত্তন করিয়া

আকারে ইঙ্গিতে অনিলার যথেষ্ট প্রশংসা করিয়া কোন প্রকারে চায়ের পেয়ালাটা নিঃশেষ করিয়া বাহির হইয়া পড়িল।

কিরণ চলিয়া গেলেই প্রকাশ বলিল, 'বঙ্কিমবাবুর না কার একটা লেখা পড়নি হে—বাঙ্গালীরা তাদের স্ত্রীকেই সব চেয়ে সুন্দরী মনে করে। আজ স্বচক্ষে দেখ্‌লে ?"

বিপিন কহিল, "তাইতেই রক্ষে। নতুবা তোমার সঙ্গে আজ হাতাহাতি হয়ে যেত।"

প্রকাশ কহিল, "তা হলেই ছিল ভাল। ওর বাড়ীতে যেয়ে আমি আবার কি করে পাত পাড়্‌বো, তাই ভাবচি। সে আবার বৌ-ভাতের নেমন্তন্ন কর্ত্তে এসেচে এখানে—আশ্চর্য্য!"

প্রকাশ কথা কহিতে কহিতে অনেকবারই বীণার দিকে চাহিল, কিন্তু বীণা তেমনি চুপ করিয়া রহিল, একটা কথারও কোন জবাব করিল না। প্রকাশ কিছুটা অপ্রস্তুত হইয়া কহিল "শুনলুম, শেষটা একটা নিতান্ত দীন দরিদ্রের মেয়েকে বিনা টাকা পয়সায়ই বে কল্লে। যাক্ পাড়াগেঁয়ে মেয়েটা দেখে আসা যাবে। কি বল হে ?"

বিপিন যেন কিছুটা অন্য মনস্কভাবে কহিল, "হুঁ।" এইবার বীণা কহিল, "বৌভাতে যাবেন আপনারা সব, কিছু যৌতুক দেবেন না ?"

বিপিন কহিল, "আমরা আবার কি দেব ?"

প্রকাশ কহিল, "মেয়েটা যদি পড়া শোনা জান্‌তো শুনতুম— এক আধখানা বই টই দিতুম। এখন দিতে হলে যে শুধু ২।১টা

টাকাই দিতে হয়। তেমন তেমন বুঝি তো তাই দিয়ে সটুকে আসবো।"

বীণা তাহার হাতের অঙ্গুলীতে একটা আংটী দেখাইয়া কহিল, "আমি এইটে দেব ?"

প্রকাশ ও বিপিন উভয়েই আশ্চর্য্য হইয়া কহিল, "সে কি ?" বীণা কহিল, "এটা তো আমাকে আর কারো—দেওয়া নয়, আমি পরীক্ষা দিয়ে প্রাইজ পেয়েছিলুম, এটাতে কারু আপত্তি খাটতে পারে না। তোমরা আপত্তি করো না—"

বিপিন বিরক্তি দেখাইয়া কহিল, "এ বাড়াবাড়ি হবে, কি বল প্রকাশ ?"

প্রকাশ কহিল, "এসব বিষয়ে আমার বেশী বলবার অধিকার নেই বিপিন। আমার এ ক্ষেত্রে চুপ করে থাকাই ভাল। কি বল ?" বীণা আর শব্দ করিল না। প্রকাশও তারপর একদম কথা বন্ধ করিয়া ফেলিল। সে দিন গান বাজনা ও আমোদ প্রমোদটা এই ভাবে মাটী হইয়া গেল। সকলে চলিয়া যাইতেই রাগে দুঃখে বীণা দুই ফোঁটা চোখের জল ফেলিয়া—সটান বিছানায় যাইয়া শুইয়া পড়িল।

—

(১১)

কিন্তু বৌভাতের দিন বৌ দেখিতে যাইয়া এ মজলিসটার সকলেরই চক্ষু স্থির হইয়া গেল। বাস্তবিক, এ তো তেমন অবহেলা করিবার সামগ্রী নয়। মেয়েটার চেহারা দেখিয়াই বোধ হইতেছে, তাহার যেমনি শান্ত মধুর চরিত্রটা—তেমন স্থির অচঞ্চল বুদ্ধি। তারপর পাড়াগাঁয়ের মেয়ের বিশ্রী গন্ধটাও তাহার গায়ে যে খুব পাওয়া গেল—এখনও মনে হইল না। পাড়াগাঁয়ের মেয়ের মত তো এ সাজ পোষাক নয়। বাস্তবিক বীণা লজ্জায় পড়িয়া কিছুতেই আর তাহার ঈপ্সিত যৌতুকটা বধূর অঙ্গুলীতে তুলিয়া দিতে পারিল না। যে গায়ে এত হীরা মণিমুক্তা, এই সামান্য ক্ষুদ্র অঙ্গুরী সে কোন্ সাহসে তাহার হস্তে পরাইয়া দিতে যাইবে। বিপিন ও প্রকাশ উভয়েই যেমন দুটী টাকা মাত্র যৌতুক দিয়া এই দায় হইতে আপনাদিগকে মুক্ত করিয়া লইয়া আসিল, বীণাও অগত্যা সেই পন্থাই অনুসরণ করিল। সে তাড়াতাড়ি কাজটা সারিয়া দাদাকে তাড়া দিয়া গাড়ীতে আসিয়া বসিল। প্রকাশও হতবুদ্ধি হইয়া চলিয়া আসিল।

কিন্তু এসব যাই হোক্, কিরণ ৯।১০জনকে লইয়া—শ্বশুরালয় যাত্রা করিল। অনিলার বাপ-মা এসব খবর কিছুই জানেন না। কান্তিবাবু টেলিগ্রাফে সংবাদ পাঠাইয়া জানাইলেন, তিনি যোগাড় যন্ত্র করিয়া অনিলার বিবাহ দিতেছেন, বরকনে শীঘ্র দেশে যাইতেছে, তাহাদের

রীতিমত অভ্যর্থনার বন্দোবস্ত করার জন্য দু'শ টাকা খরচ পাঠানো গেল।

কান্তিবাবুর এই চিঠি ও টাকা পৌঁছিতে গ্রামে একটা হুলুস্থূল পড়িয়া গেল। গ্রামের পণপ্রথা নিবারণী সভার মেম্বরগণ ক্ষেপিয়া গেলেন, নিরাশ্রয় মেয়েটাকে যে বরের বাপ এমন বিনা পণে বিনা যৌতুকে গ্রহণ করলে তাকে একটা বিরাট প্রশংসাপত্র দেওয়া চাই। স্বয়ং সভাপতি ধনঞ্জয়বাবুকে লইয়া তাহারা একটা খসড়া ঠিক করিতে লাগিলেন এবং সেই অভ্যর্থনা পত্রটার শেষে এই সৎকার্য্যে সহায়তার দরুন কান্তিবাবুকেও—একটা ধন্যবাদ দেওয়ার বন্দোবস্ত হইল। বেশ আড়ম্বরের সহিতেই পত্রখানি ছাপাইয়া আনা গেল এবং স্থির হইল যেদিন বর ক'নে আসিয়া গ্রামে পৌঁছিবে, সেই দিনই সন্ধ্যার সময়—বরের পিতা আসিলে তাহাকে অথবা তদনুপস্থিতে তাহার ছেলে বরকেই অভ্যর্থনা করিয়া সেটা দেওয়া হইবে এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে গ্রামের অন্যান্যকেও পত্রগুলি বিলি করিয়া দেওয়া হইবে।

কিন্তু এ লইয়া যতই আড়ম্বর উৎসব হোক এই বর বা বরের পিতা উভয়েই যে বিশেষ একটা 'হোমরা চোমরা' কেউ নয়, তাহা তাহারা বুঝিয়া লইলেন এবং শুধু কেবলই অপরকে এই শুভদৃষ্টান্তে অনুপস্থিত করিবার জন্যই যে এ সবের অনুষ্ঠান তাহাই পরস্পর মুরুব্বিয়ানা করিয়া বলাবলি করিতে লাগিলেন। এ বিশ্বাসটা অনিলার পিতামাতার আরও দৃঢ় হইল। সে জন্য তাহাদেরও উৎকণ্ঠাও দেখা গেল সকলের অপেক্ষা অধিক। একমাত্র দুহিতাটিকে কান্তিবাবু লইয়া যাইয়া কাহার এবং কি শ্রেণীর লোকের হস্তে সঁপিয়া দিলেন,

ভাবিয়া ভাবিয়া স্বামী স্ত্রীর চিন্তার অবধি রহিল না। তাহারা নিতান্ত অধৈর্য্য ভাবেই বর ক'নের আগমন প্রতীক্ষা করিয়া রহিলেন, এমনই অবস্থায় হঠাৎ একদিন হরিশ ঘটক আসিয়া দেখা দিলেন।

ধনঞ্জয় বাবুর দরবারে, ঐ আবেদন পত্রটা পাঠ করিয়া কি করিয়া সম্প্রদান করিতে হইবে, তাহারই মহড়া চলিতেছে, এমন সময়েই একদিন হরিশ আসিয়া উপস্থিত। হরিশ কহিল—"ওগো, হচ্চে কি ও সব?"

তাহাকে দেখিয়া সকলেই চেঁচাইয়া উঠিল, "এই যে, এই যে ওহে এই যে ঘটক চূড়ামণি এসেচে। এসো এসো—"

ধনঞ্জয় বাবু তাড়াতাড়ি উঠিয়া আসিয়া তাহাকে আদর করিয়া কহিলেন, "কখন এলে ভায়া? এ গাড়ীতে? ওরা এসেছেন তো?"

হরিশ গায়ের গরম চাদরখানা খুলিয়া ভাল করিয়া গায় দিতে দিতে বলিল, "হাঁ, আসচেন—ভারী একটা অদ্ভুত কাণ্ডই করে এলুম।"

দু'একজন বলিয়া উঠিল, "কাণ্ডটা তাহলে তোমারি সব। আমরা আগেই বুঝেছিলুম, হরিশ ঘটক না হলে আর এমন মেয়ের বে হয়—"

ধনঞ্জয় বাবু আগ্রহপূর্ণ স্বরে বলিয়া উঠিলেন, "লোকটা কে হে? বড় অগ্নি গ্রহণ কল্লে সে?"

হরিশ হাসিয়া কহিল, "শুধু অগ্নি নয়, বে'র খরচপত্রটাও ঘাড়ে তুলে নিয়েছে, তারপর এ ঘটক মহাশয়কেও তিন চারশ টাকা—নগদ—"

সকলের চক্ষু স্থির। ধনঞ্জয় বাবু কহিলেন, "তাহলে লোকটার অবস্থাও ভাল তা বোঝা যাচ্ছে।"

"দেখলেই বুঝতে পার্ব্বে। বোধ হয় এসে পড়লো। আসুন আসুন—"

ধনঞ্জয় বাবু কহিলেন, "আচ্ছা চলহে, কাগজগুলি সঙ্গে নাও—"

হরিশ কহিল, "কিসের কাগজ।"

ধনঞ্জয় বাবু হাসিয়া একখানি কাগজ দেখিতে তাহার হাতে দিলেন। কাগজখানি পড়িয়া—হরিশের মুখে কৌতুকের মৃদু হাসি ছড়াইয়া পড়িল। হরিশ কহিল, "এটা দেবে কে?"

ধনঞ্জয় বাবু সগর্ব্বে কহিলেন, "আর কে? সভাপতি আমি—এ যে আমারই কাজ। বরের বাবা এসেচে তো?"

হরিশ কহিল, "না। রক্ষে। বরং এটা এখন রেখে দিন, ডাকে পাঠিয়ে দেবেন এখন দত্ত মশাই।"

কিন্তু দত্ত মশাই আপনার প্রাধান্য প্রদর্শনের এমন একটা সুযোগ ছাড়িতে নারাজ। বলিলেন, "তা করা যাবে, কিন্তু আপাততঃ একটা দেওয়াই চাই, নয়তো উৎসবটাই মাটী হবে। বরকেই তাহলে—"

কথা বলিতে বলিতে তাহারা ব্রজবাবুর বাড়ীর কাছে আসিয়া পড়িয়াছিলেন, এমন সময় মহাকোলাহল শ্রুত হইল। কয়েকজন গ্রাম্য মাতব্বর কোলাহল করিতে করিতে ফিরিয়া আসিতেছিল, হঠাৎ তাহাদিগকে দেখিয়া কহিলেন, "আর দেখবে কি? ভারি মজার কাণ্ড। আমাদের কান্তিবাবুর ছেলে। দেখগে, মেয়েকে কত গয়না, কত জিনিসপত্র দিয়েছে—গরীব বেচারার রাখবারও ঠাঁই নেই—"

ধনঞ্জয়বাবু হঠাৎ দাঁড়াইয়া বলিলেন, "কি হে হরিশ, সত্যি নাকি?"

হরিশ কহিল, "আজ্ঞে, এক কথাও মিথ্যা নয়।"

ধনঞ্জয় বাবুর মুখ-চোখ হঠাৎ লাল হইয়া উঠিল, বলিলেন, "তুমি তুমি—"

হরিশ হাসিয়া কহিল, "আমার ব্যবসা ওই মশাই, কি কর্ব্ব বলুন, তিন চারশ টাকা—"

এত লোকের সাম্‌নে আর বিশেষ কিছু বলা সম্ভব হইয়া উঠিল না। এই মহা বিস্ময়ের মধ্যেও ২।১ জন ধনঞ্জয় বাবুর কথা ফিরাইয়া কহিলেন, "আচ্ছা, তোমরা তবে যাও, আমি একটু পরে যাচ্ছি। জানাবার অত তাড়াতাড়িই কি?"

ধনঞ্জয় বাবু হঠাৎ ফিরিতে চাহিলেন। কিন্তু যে লোকটা এত কষ্ট করিয়া রিহার্সেল দিয়া কাগজখানি পড়িবার ভঙ্গি ঠিক করিয়াছিল, সে গোলমাল বাধাইল। কহিল, "তা হবে না দত্ত মশাই। আমার কষ্টের শেষ, যেতেই হবে এখন আপনাকে আমাদের সঙ্গে। আমি কাগজখানি পড়ে ফেল্লে, আপনি কিরণের হাতে ওখানি দিয়ে তবে ফিরে যাবেন। সভাপতি না গেলে ব্যাপারটাই পণ্ড হবে।"

দলের অন্যান্য সকলেই এই কথায় সায় দিয়া বসিলেন। ধনঞ্জয় বাবু অগত্যা ফাঁসীকাষ্ঠাভিমুখগামী আসামীর মত তাহাদের সঙ্গে সঙ্গেই যাইতে লাগিলেন।

পরের অনিষ্ট করিতে গেলে ভগবান যে তার অনিষ্টটাই আগে কি করিয়া করেন, পিছনে থাকিয়া থাকিয়া, পণপ্রথা নিবারণীর এই মুহ্যমান সভাপতিটীর দিকে চাহিয়া, হরিশ আজ তাহার একটা জাজ্জ্বল্যমান প্রমাণ পাইল।

সম্পূর্ণ।